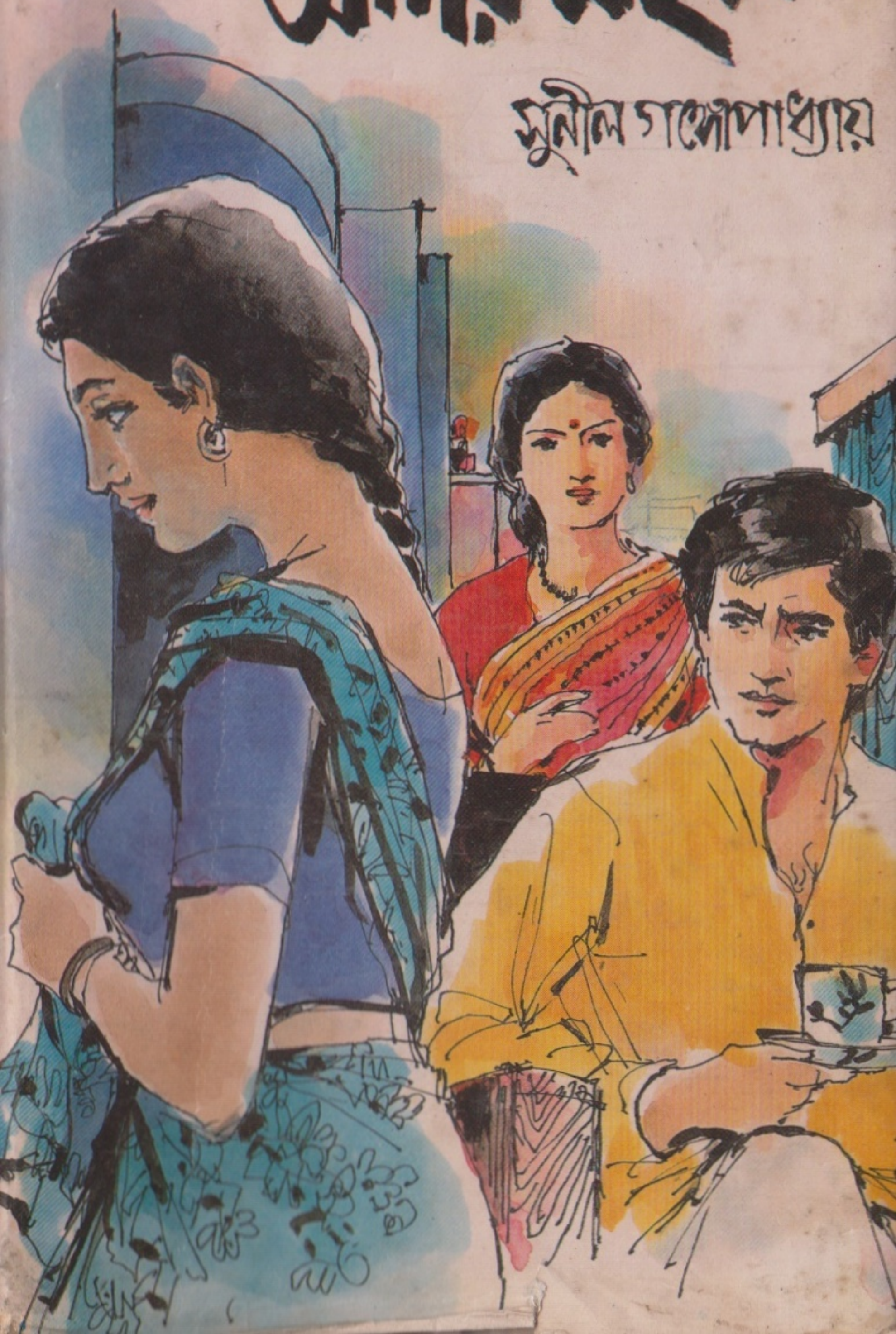
অন্দর মহল

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়



অন্দর মহল

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সাহিত্যম্
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

প্রকাশক ❐
নির্মলকুমার সাহা
সাহিত্যম্
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ ❐
সুধীর মৈত্র

মুদ্রক ❐
প্রদীপকুমার সাহা
লোকনাথ বাইন্ডিং এন্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৪বি, কলেজ রো
কলিকাতা - ৭০০ ০০৯

লেজারটাইপ সেটিং ❐
পেজমেকার্স
২৩বি, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা - ৭০০ ০২৬

দাম ❐
১৬.০০ টাকা

উৎসর্গ

মঞ্জুলা মিত্র

ও

তরুণ মিত্রকে

॥ এক ॥

শৈবালের ফিরতে রোজই বেশী রাত হয়। অফিস থেকে সোজাসুজি বাড়ি ফেরার ধাত নেই। বন্ধুবান্ধবের বাড়ি কিংবা দু-একটা ক্লাব ঘুরে আসে। যেদিন তাসের আড্ডায় জমে যায়, সেদিন এগারোটা বেজে যায়।

এ জন্য তার প্রত্যেক দিনেরই একটা বকুনির কোটা আছে। প্রমিতা তার জন্য জেগে বসে থাকে। ঝি-চাকরদের বেশী খাটাবার পক্ষপাতী নয় প্রমিতা। রান্নার লোকটিকে সে রোজ রাত দশটার সময় ছুটি দিয়ে দেয়। শৈবাল তারও পরে ফিরলে প্রমিতা নিজেই তার খাবার গরম করে দেবে, পরিবেশন করবে আর সেই সঙ্গে চলতে থাকবে বকুনি।

শৈবাল তখন দুষ্টু ছেলের মতন মুখ করে শোনে।

প্রত্যেক দিনই সে প্রতিজ্ঞা করে যে কাল আর কিছুতেই দেরি হবে না। এক একদিন মেজাজ খারাপ থাকলে সে অবশ্য উল্টে কিছু কড়া কথা শুনিয়ে দেয় প্রমিতাকে। সাধারণত তাসে হারলেই তার এ রকম মেজাজ খারাপ হয়।

ওদের দুটি ছেলেমেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে দশটার মধ্যে। সুতরাং বাবা মায়ের ঝগড়া তাদের শুনতে হয় না। শৈবাল প্রমিতাও প্রাণ খুলে চোখাচোখা বাক্য বিনিময় করে যেতে পারে।

সেদিন রাত্রে শৈবাল খাবার টেবিলে বসে মাছের ঝোল পর্যন্ত পৌঁছেছে, ঝগড়াও বেশ জমে উঠেছে, এই সময় সে দেখল, সতেরো-আঠারো বছরের একটি সম্পূর্ণ অচেনা মেয়ে তাদের রান্নাঘরের পাশ দিয়ে বেরিয়ে, লাজুক ভঙ্গিতে মুখ নীচু করে হেঁটে বারান্দার দিকে চলে গেল।

বিস্ময়ে ভুরু উঁচু হয়ে গেল শৈবালের।

প্রমিতা ফিসফিসিয়ে বলল, ও আজই এসেছে। তোমাকে একটু পরে বলছি ওর কথা।

তবু শৈবালের বিস্ময় কমে না। ব্যাপার কী? বাড়িতে একটা অনাত্মীয় যুবতী মেয়ে রয়েছে এত রাত্রে, অথচ এর কথা প্রমিতা এতক্ষণে একবারও বলেনি!

এই উপলক্ষে ঝগড়াটা থেমে গেল এবং শৈবাল নির্বিঘ্নে বাকি খাওয়াটা শেষ করল।

এরপর সাধারণত শৈবাল বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটি সিগারেট শেষ করে। সারা দিন রাতের মধ্যে এইটুকুই তার প্রকৃতি উপভোগের সময়।

কিন্তু অচেনা মেয়েটি রয়েছে বারান্দায়। সুতরাং শৈবাল সিগারেট ধরিয়ে শোবার ঘর আর খাবার ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। আড়চোখে দু-একবার মেয়েটির দিকে না তাকিয়ে পারল না। সে পুরুষমানুষ, এটুকু কৌতূহল তার থাকবেই।

মেয়েটির মুখ ভালো করে দেখতে পায়নি শৈবাল। এখনো তার মুখ অন্ধকারের দিকে ফেরানো। সুন্দর ছাপা শাড়ি পরে আছে সে। কোন দূর সম্পর্কের আত্মীয়া? প্রমিতার কোন বান্ধবীর বোন? পাড়ায় অন্য কোন বাড়ি থেকে রাগ করে পালিয়ে আসা কোন মেয়ে? প্রমিতার নানা রকম বাতিক আছে, সে রকম কোন মেয়েকেও আশ্রয় দিতে পারে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

প্রমিতা টুকিটাকি কাজ সারছে রান্নাঘরে। খাওয়ার পর সাধারণত আধঘন্টার মধ্যে শুতে যায় না শৈবাল। কিন্তু আজ একটা বই খুলে বিছানায় গিয়ে বসল।

মোট আড়াইখানা ঘরের ছোট ফ্ল্যাট। রান্নাঘরের সামনে একটুখানি জায়গায় খাবার টেবিল পাতা। আর একটা বারান্দা। এক ঘরে ছেলেমেয়েরা শোয়, আর এক ঘরে ওরা দুজন। বাকি আধখানা ঘরটি ওদের বসবার ঘর। খুবই সংক্ষিপ্ত ব্যাপার সেটি।

সল্ট লেকে খানিকটা জমি কেনা আছে, কিন্তু সেখানে বাড়ি করার ব্যাপারে শৈবাল বা প্রমিতার কারোই বিশেষ আগ্রহ নেই। শৈবালের মতে বাড়ি বানানো মানেই ঝামেলা। আর প্রমিতা অতদূর যেতে চায় না। তার সব চেনাশুনো, বন্ধু, আত্মীয়স্বজন এদিকে থাকে।

অন্য দিনের চেয়ে খানিকটা দেরি করে এলো প্রমিতা। শোওয়ার ঘরের দরজা বন্ধ করল। এবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার ক্রিম মাখা ও চুল আঁচড়ানোর পর্ব শুরু হবে। তাতে সময় লাগবে মিনিট কুড়ি। বাকি কথাবার্তা এই সময়েই সেরে নিতে হয়।

শৈবাল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তারপর?

প্রমিতা মুখ ঘুরিয়ে বলল, আস্তে, একটু আস্তে কথা বল।

শয়নকক্ষে কেউ চিৎকার করে না। বিশেষত শান্তির সময়ে। অন্য দিন যে স্বরগ্রামে কথা বলে শৈবাল, আজও সেইভাবেই বলছিল, হঠাৎ তাতে আপত্তি দেখা দিল কেন?

প্রমিতা বলল, মেয়েটি এই বারান্দাতেই শুয়েছে।

এ ঘরের পাশেই বারান্দা। সেখান থেকে সব কথা শোনা যাবে। কিন্তু মেয়েটি বারান্দায় শোবে কেন? হঠাৎ কোন অতিথি এলে তো বসবার ঘরটাতেই বিছানা করে দেওয়া হয়। এখন প্রায়ই শেষ রাতের দিকে ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে।

প্রমিতা বারান্দার দিকের জানালাটা বন্ধ করে দিল।

ক্ষীণ প্রতিবাদ করে শৈবাল বলল, এই গরমের মধ্যে...

খানিকটা পরে আবার খুলে দেব।

অর্থাৎ তাদের কথাবার্তা শেষ হলে, আলো নেভাবার পর জানালা আবার খোলা হবে।

বারান্দায় শোবে? যদি বৃষ্টি আসে?

বলে দিয়েছি, বৃষ্টি এলে বিছানাটা টেনে নিয়ে যাবে রান্নাঘরের সামনে।

কেন, বসবার ঘরটায়।

প্রমিতা চোখের ভঙ্গিতে জানাল, তার দরকার নেই।

মেয়েটি কে?

ওকে আজ অরুণরা দিয়ে গেছে।

তার মানে?

অরুণরা বলে গেল ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে...

অরুণরা এক পাগলের জুটি। অরুণ আর তার বিদেশিনী স্ত্রী মার্থা। ওদের জীবন সাংঘাতিক বৈচিত্র্যপূর্ণ। প্রত্যেক দিনই ওদের জীবনে একটা না একটা কাণ্ড ঘটে।

ওর বাড়ি কোথায়? সেখানে আমরা কেন ওকে পাঠাব!

শোন, তোমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছি...সেই যে সত্যানন্দ একটা বাচ্চা মেয়েকে আমাদের বাড়িতে এনে দিল, তোমার মনে আছে? রেণু নাম ছিল, দু-তিন দিন কাজ করেছিল এখানে...

এ সব শৈবালের মনে থাকার কথা নয়, জানারও কথা নয়। যাই হোক, সে কোন মন্তব্য করল না।

সেই রেণু কিছুদিন আগে অরুণদের ওখান থেকে ছুটি নিয়ে দেশে চলে গিয়েছিল...জানো তো ওদের ব্যাপার, সাত দিন বাদেই ফিরবে বলে যায়, কিন্তু কক্ষণো ফেরে না। একুশ দিন বাদে সেই রেণু নিজে না ফিরে ওর দিদিকে পাঠিয়েছে...বলছে তো যে রেণুর অসুখ, সে আর কাজ করবে না, তার বদলে তার দিদি, ওর নাম হেনা।

শৈবাল আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ঝি-চাকরের ব্যাপার ? প্রমিতার এই সব ব্যাপারে দারুণ উৎসাহ। কতবার যে বাড়ির কাজের লোক আর রান্নার লোক বদলায় !

কিন্তু এই মেয়েটি ঝি ? এত ঝলমলে শাড়ি পরা, মোটামুটি দামীই তো মনে হল শাড়িটা। যুবতী মেয়ে, দামী শাড়ি অথচ ঝিয়ের কাজ করে—ব্যাপারটা সন্দেহজনক।

শৈবালের চোখের ভাষা পড়ে নিয়েই বোধহয় প্রমিতা বলল, এমন ঝুলঝুলি নোংরা একটা শাড়ি পরে এসেছিল যে দেখেই ঘেন্না করছিল আমার। সেই জন্য আমার একটা শাড়ি দিলাম ওকে।

তোমার শাড়ি ? তাই বল ! সেই জন্যই চেনা চেনা লাগছিল।

তুমি আমার সব শাড়ি চেনো ? ছাই চেনো ! আচ্ছা, অরুণরা কী বল তো, ঐ রকম একটা ছেঁড়া নোংরা শাড়ি দেখেও সেই অবস্থায় আমাদের বাড়ি রেখে গেল ? একটু চক্ষুলজ্জা নেই ?

মার্থা তো শাড়ি পরে না, সে আর তোমার মতন হুট করে একটা শাড়ি দেবে কি করে ? স্কার্ট বা ফ্রক দিতে পারত অবশ্য, কিন্তু স্কার্ট পরা ঝি ঠিক আমাদের দেশে চলবে কি ?

আহা হা, একটা শাড়ি কিনেও তো দিতে পারত ! এদিকে তো গরীব দুঃখীদের সম্পর্কে কত বড় বড় কথা বলে...একটা উঠতি বয়েসের মেয়ে...।

সে কথা থাক। কিন্তু অরুণরা ওকে আমাদের বাড়িতে রেখে গেল কেন ?

অরুণরা যে ইতিমধ্যে আর একটা লোক রেখে ফেলেছে। তা ছাড়া মার্থা বলছে, বাড়িতে আর কোন মেয়ে রাখবে না, ছেলে কাজের লোক রাখবে।

কেন, মেয়ে রাখবে না কেন ?

রাখবে না। কোনো অসুবিধা আছে নিশ্চয়ই !

মার্থা কি তার স্বামীকে সন্দেহ করে নাকি ?

এই, বাজে কথা বলো না !

তাও না হয় বুঝলাম। কিন্তু সে জন্য মেয়েটিকে আমাদের বাড়িতে রেখে যাবার কারণ কি ?

ঐ যে, রেণুকে আমরাই যোগাড় করে দিয়েছিলাম।

সেই জন্য তার দিদি আমাদের বাড়িতে ফেরত আসবে ? আমাদের বাড়িতে ক'জন লোক লাগবে ?

এ ফ্ল্যাটে একজন ঠিকে ঝি এসে বাসন-পত্র মেজে দিয়ে যায়। আর একটা রান্নার লোক রাখতে হয়েছে। শৈবাল গোড়ার দিকে ক্ষীণ আপত্তি করেছিল এ ব্যাপারে

সে বলেছিল, আমরা বরাবর মা-ঠাকুমার হাতের রান্না খেয়েছি। বাইরের লোকের রান্না তো দোকানে-টোকানে গিয়েই খেতে হয়। আজকালকার মেয়েরা কি একদম রান্না ভুলে যাবে? তোমার তো হাতে অনেক সময় থাকে—

প্রমিতা ফোঁস করে উঠে বলেছিল, তুমি বুঝি রান্না করার জন্য আমায় বিয়ে করেছিলে। সারা দিন আমি উনুনের আঁচের সামনে থাকব, আর তুমি বাইরে বাইরে গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়াবে!

মেয়েদের ধারণা, পুরুষরা যে অফিসে চাকরি করে বা টাকা রোজগার করে, সেটা কোন পরিশ্রমের ব্যাপার নয়। যত খাটুনি শুধু বাড়ির মেয়েদের।

প্রমিতা আরও বলেছিল, আমি যদি রান্না করি, তাহলে ছেলেমেয়ে দুটোকে পড়াবে কে? বেশ, তাহলে আমি রান্না করছি, তুমি ওদের পড়াবার জন্য মাস্টার রাখ!

এ যুক্তি অকাট্য। প্রমিতা বি.এস-সি. পাস। তাকে রান্নার কাজে নিযুক্ত রেখে ছেলেমেয়েদের জন্য অন্য মাস্টার আনা মোটেই কাজের কথা নয়। তা ছাড়া মাস্টার রাখার খরচ অনেক বেশী। সুতরাং রান্নার জন্য ঠাকুর বরাদ্দ হল।

কিন্তু এই বারো বছরের বিবাহিত জীবনে অন্তত ন'বার রান্নার ঠাকুর বদল করেছে প্রমিতা। কখনো স্ত্রীলোক, কখনো পুরুষ। এরা প্রত্যেকেই যখন প্রথম এসেছে, তখন প্রমিতা এদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। প্রত্যেকবার প্রমিতা বলেছে এবার যে লোকটি পেয়েছি, ঠিক এই রকমই একজনকে চাইছিলাম।

শৈবাল মুচকি হেসেছে শুধু।

দু-তিন দিন পরই প্রমিতা সেই লোককে অপছন্দ করতে শুরু করে। একটা না একটা খুঁত বেরোয়।

শৈবাল প্রমিতাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে ঝি-চাকর তো আর দর্জির কাছে অর্ডার দিয়ে তৈরি করানো যায় না। সুতরাং ঠিক-ঠাক মাপ মতন হয় না। ওরই মধ্যে যতদূর সম্ভব মানিয়ে নিতে হয়।

প্রথম দিন যাকে দেখে প্রমিতার খুব মায়া পড়ে যায়, মাস খানেক পরেই তাকে তাড়াবার জন্য সে একেবারে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কত রকম দোষ বেরিয়ে পড়ে তাদের।

প্রত্যেকবার রান্নার লোককে বিদায় করে দিয়ে প্রমিতা মন খারাপ করে থাকে কয়েক দিন, তার মনটা এমনিতে নরম, হুট করে বাড়ি থেকে একজন লোককে তাড়িয়ে দিয়ে সে মোটেই খুশি হয় না। অথচ রাগের মাথায় তাদের ছাড়িয়েও দেয়।

এখন যে ছেলেটি রান্না করছে, সে প্রায় দেড় বছর টিকে আছে। এরও অনেক দোষ বার করেছে প্রমিতা, কিন্তু এর একটি প্রধান গুণ, শত বকুনি খেলেও কক্ষনো

মুখে মুখে কথা বলার চেষ্টা করে না। অপরাধীর মতন মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। নিছক বকুনি সহ্য করার ক্ষমতার জন্যই সে এখনো চাকরি হারায়নি। নইলে, রান্না অবশ্য সে মোটামুটি খারাপই করে। তার রান্না শৈবালের পছন্দ না হলেও সে ঘুণাক্ষরে কোনদিন সে কথা জানায়নি।

অথচ প্রমিতা মোটেই ঝগড়াটি নয়, বকাবকি করা স্বভাবও নয় তার। বাইরের সবাই প্রমিতার স্বভাবের খুবই প্রশংসা করে। শুধু প্রমিতার আছে পরিস্কার-বার্তিক। তার সঙ্গে ঝি-চাকর কিংবা রান্নার লোকরা পাল্লা দিতে পারে না।

কিন্তু আমাদের তো এখন লোক দরকার নেই। অনন্তকে তুমি ছাড়িয়ে দিতে চাও নাকি?

প্রমিতা বলল, সে কথা আমি বলেছি? আমাদের এখানে রাখবার কোন প্রশ্ন উঠছে না। অরুণরা বলেছে, ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে।

সে ব্যবস্থা অরুণরা করতে পারেনি? আমাদের ওপরে চাপিয়ে দিয়ে গেছে কেন?

তোমারই তো বন্ধু। তুমি জিজ্ঞেস কোরো।

তুমি রাখলে কেন?

বাড়িতে এনে ফেলেছে তাড়িয়ে দেবো।

কোথায় বাড়ি ওর?

বনগাঁর দিকে কি যেন স্টেশনের নাম বলল।

ঠিক আছে, কাল অনন্তকে বোলো ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবে—

প্রমিতার রাত্রির প্রসাধন শেষ হয়ে গেছে। পোশাকও বদলে নিয়েছে। এবার সে আলো নিভিয়ে শুতে আসবে। এক একদিন প্রমিতা শুতে আসবার আগেই ঘুমিয়ে পড়ে শৈবাল। আজ প্রমিতার গল্প করার ঝোঁক এসেছে।

বিছানায় উঠে এসে প্রমিতা বলল, মেয়েটার সঙ্গে আমি কথা বলছিলাম...শুনলে বড্ড কষ্ট হয়...দেশে ফিরে যাবে, কিন্তু সেখানে গিয়ে কি খাবে তার ঠিক নেই...একদম নাকি খাওয়া জোটে না...ওরা সাত ভাই বোন, ওর বাবা নাকি বলেছে, নিজেরা যেমন করে পারে খাবার যোগাড় করে নিক্! লোকটা মানুষ না পশু? বাবা হয়ে এ কথা ছেলেমেয়েদের বলতে পারে?

শৈবাল একটি রাজনৈতিক বক্তৃতা দেবার উদ্যোগ করেও থেমে গেল। শুরু করলে অনেকক্ষণ সময় লাগবে।

প্রমিতা বলল, আমি ভাবছি...

ওকে আমাদের এখানেই রেখে দেবে?

না না, এত লোক রেখে আমরাই বা চালাব কি করে ? আমার দিদি একজন কাজের লোকের কথা বলছিল...জানি না পেয়েছে কি না...কাল দিদির কাছে একবার খবর নেব, ওকে যদি রাখে।

শৈবাল গোপনে হাসল। ঝি-চাকরের ব্যাপারে প্রমিতা যেন একটি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের যার যখনই কাজের লোকের দরকার হয়, অমনি তারা ফোন করে প্রমিতাকে। প্রমিতারও এ ব্যাপারে প্রবল উৎসাহ, অন্য কারুর অসুবিধে হলে তারই যেন বেশী দুশ্চিন্তা। শৈবাল এ জন্যই বাড়িতে নিত্য নতুন ঝি-চাকর দেখতে পায়।

একবার প্রমিতা তার ছোটমাসীর বাড়িতে একটি চাকর পাঠিয়েছিল। সাত দিনের মধ্যেই সেই চাকরটি সে বাড়ি থেকে ঘড়ি, রেড়িও, প্রচুর জামা-কাপড় আর কিছু টাকা-পয়সা চুরি করে পালায়।

খবর শুনে প্রমিতা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিল।

ছেলেটিকে প্রমিতা যোগাড় করেছিল মুড়িওয়ালার কাছ থেকে। সেই লোকটি তিন-চার বছর ধরে ওদের বাড়িতে নিয়মিত মুড়ি দিয়ে যায়। সেই লোকটিকে বেশ বিশ্বাসী ধরনেরই মনে হত। এর আগেও সে গ্রাম থেকে দু-তিনজন ছেলেমেয়েকে এনে দিয়েছে ঝি-চাকরের কাজের জন্য।

এই ঘটনার পর সেই মুড়িওয়ালার আর পাত্তা নেই।

প্রমিতা এমনভাবে হা-হুতাশ করতে লাগল, যেন তার নিজের বাড়ি থেকেই চুরি গেছে। সারা দিন শৈবালকে একটুও শান্তিতে থাকতে দিল না।

শৈবাল শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেছিল, চুরি হয়েছে তো কি আর করা যাবে ? কলকাতা শহরে সব বাড়ি থেকেই একদিন না একদিন চুরি হয়। কলকাতায় থাকতে গেলে এ রকম একটু সহ্য করতেই হবে।

তা বলে আমার জন্য ছোটমাসীর এত ক্ষতি হয়ে গেল ?

তোমার জন্য !

তা নয় তো কি ! আমিই লোকটাকে দিলাম।

কেন দিতে গিয়েছিলে ? তোমার কি দরকার এই সব ঝামেলায় যাবার ? কে তোমায় মাথার দিব্যি দিয়েছে ?

আমার ছোটমাসীর অসুবিধে হলে আমি কিছু ব্যবস্থা করার চেষ্টা করব ছি, ছি, এতগুলো টাকা।

শৈবাল রেগে উঠে বলেছিল, তাহলে কি বলতে চাও, ছোটমাসীদের যত টাকা

ক্ষতি হয়েছে, সব আমাকে দিতে হবে ?

শেষ পর্যন্ত ছোটমাসী প্রমিতাকে এত অস্থির হতে দেখে নিজেই এসে বলেছিলেন, তুই এত ভাবছিস কেন ? যা গেছে তা তো গেছেই। ছেলেটাকে দেখে তো আমারও ভালো মনে হয়েছিল প্রথমে।

তারপর শৈবাল প্রমিতাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিল, সে আর ভবিষ্যতে অন্য কারুর বাড়ির ঝি-চাকর সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। সে প্রতিজ্ঞা প্রমিতা একমাসও রাখতে পারেনি। আবার সব ঠিক আগের মতন চলছে।

হাতের সিগারেটটা নিভিয়ে দিয়ে শৈবাল জিজ্ঞেস করল, এই মেয়েটির বিয়ে হয়েছে ?

না বোধহয়। মাথায় সিঁদুর তো দেখলাম না।

এত বড় মেয়ে, বিয়ে হয়নি ! ওদের তো কম বয়েসে বিয়ে হয়ে যায়।

ওর বাবা খেতে দিতেই পারে না তো বিয়ে দেবে কি করে।

তোমার দিদির ছেলেটি বেশ বড় হয়েছে, ও বাড়িতে এ রকম একটা যুবতী ঝি রাখা কি ঠিক হবে ?

চুপ কর, অসভ্যের মতন কথা বোলো না।

যা সত্যি, তাই বলছি। উঠতি বয়েসের ছেলেদের সামনে...

আঃ কি হচ্ছে কি ! আস্তে কথা বল না। পাশেই বারান্দায় রয়েছে মেয়েটা। সব শুনতে পাবে।

শৈবাল চুপ করে গেল। বারান্দাটা ঘরের একেবারে লাগোয়া। ওখান থেকে কথাবার্তা শুনতে পাওয়া যেতে পারে ঠিকই। জানালাটা বন্ধ রাখলে অবশ্য হয়। কিন্তু এই গরমে জানালা বন্ধ রাখার কথা ভাবাও যায় না।

আজ আর প্রমিতাকে আদর-টাদর করাও যাবে না। নিজের বাড়িতে থেকেও সব কিছু নিজের ইচ্ছে মতন করা যায় না। এই কথা বুকে নিয়ে শৈবাল ঘুমিয়ে পড়ল।

অনেক রাত্রে কিসের আওয়াজে যেন শৈবালের ঘুম ভেঙে যেতে লাগল এক একবার। বাইরে যেন খুব ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে, ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা লাগছে শৈবালের গায়ে।

সেই ঘুমের মধ্যেই তার মনে হল, মেয়েটি শুয়ে আছে বাইরের খোলা বারান্দায়, ঝড়ের মধ্যে সে কি করবে ?

কিন্তু শৈবাল উঠল না। ওটা প্রমিতার ব্যাপার, সে-ই এখন ঠ্যালা সামলাক, তার

কিছু করার নেই, এই ভেবে সে ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

॥ দুই ॥

সকালবেলা বাড়িতে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। দুই ছেলেমেয়ের স্কুল, শৈবালের অফিস। মেয়ে যাবে সাড়ে আটটায়, ছেলে ন'টায় আর সাড়ে ন'টায় শৈবালের অফিস। এর মধ্যে এক মিনিট কারুর নিশ্বাস ফেলার সময় নেই।

সেই মেয়েটি কখনো বারান্দায়, কখনো রান্নাঘরের সামনে, কখনো বাথরুমের পাশে বোকার মতন দাঁড়িয়ে থাকছে। প্রথম দিন সবাই এসে ঐ রকম বোকা হয়ে যায়। ঠিক বলে না দিলে বুঝতে পারে না কোন্ কাজটা তাকে করতে হবে। তাছাড়া এ বাড়িতে একজন কাজের লোক আছে আগে থেকেই। মেয়েটি নিজে থেকে কিছু করতে গেলে সে রেগে যেতে পারে। সে ভাববে, এই মেয়েটি বেশী কাজ দেখিয়ে তার চাকরিটা খাবার চেষ্টা করছে।

রান্নাঘর থেকে শোবার ঘরে আসবার সময় প্রমিতা বলল, এই হেনা, ও রকম দেওয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়াসনি। মাথার তেল লেগে দেয়ালে দাগ ধরে যায়।

মেয়েটি অপরাধীর মতন সরে এলো সঙ্গে সঙ্গে।

প্রমিতা বলল, তুই বরং বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাক।

কাল রাত্তিরের ঝড়-বৃষ্টির চিহ্নমাত্র নেই এখন আকাশে। এই সকালেই গনগন করছে রোদ। পাখার নীচে বসেও স্বস্তি নেই।

মেয়েদের স্কুলের গাড়ি এসে গেছে। ছেলেও বেরিয়ে গেল একটু পরে। এবার শৈবাল খেতে বসবে।

বাথরুমের দরজাটা দড়াম করে বন্ধ হতেই শৈবাল স্ত্রীর দিকে তাকাল। প্রমিতা অবাক হয়ে বলল, কে গেল বাথরুমে ? অনন্ত, অনন্ত—

শৈবাল বলল, অনন্ত নয়।

ও মা, ঐ মেয়েটা বাথরুমে গেল নাকি ?

সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে গিয়ে বাথরুমের দরজায় খট্‌খট্ করে বলল, হেনা, এই হেনা শিগ্‌গির খোল্।

শৈবাল মুচকি মুচকি হাসছে।

বাথরুমের দরজা খুলল হেনা। প্রমিতা বলল, তুই বাথরুমে যাবি, সে কথা আমাকে

বলবি তো। এই বাথরুমে নয়। নীচে আলাদা বাথরুম আছে। জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস না করেই হুট করে ঢুকে পড়লি এখানে!

অপরাধীর মতন মাথা নীচু করে রইল হেনা।

অনন্তকে ডেকে বকুনির সুরে প্রমিতা বলল, তুই ওকে নীচের বাথরুমটা দেখিয়ে দিসনি কেন? তোর এইটুকু আক্কেল নেই!

অনন্তর একটা বড় গুণ সে প্রতিবাদ করে না। সে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, এসো—

ওরা বেরিয়ে যাবার পর প্রমিতা আবার খাবার টেবিলে ফিরে এসে বলল, আমার বাথরুমে ঝি-চাকররা ঢুকলে আমার বড্ড গা ঘিনঘিন করে। ভাগ্যিস ঠিক সময়ে দেখতে পেয়েছিলাম!

শৈবাল হাসি মুখে চুপ করে রইল।

সকাল ন'টা পর্যন্ত মেয়েটি প্রকৃতির ডাক অগ্রাহ্য করে চেপে থেকেছে কী করে, সেটাই আশ্চর্য ব্যাপার!

প্রমিতা একটু অনুতপ্ত গলায় বলল, অবশ্য, ও বেচারা জানে না, ওর দোষ নেই। সকালবেলা আমারই মনে করে বলে দেওয়া উচিত ছিল অনন্তকে। নানান্ ঝঞ্ঝাটে ভুলে গেছি।

শৈবাল জিজ্ঞেস করল, কাল রাত্রিরে ঝড়-বৃষ্টি হয়েছিল?

দারুণ ঝড়-বৃষ্টি। জলের ছাঁট এসে ঢুকছিল ঘরে।

তখন ঐ মেয়েটি কী করল?

আমি উঠে ওকে ভেতরে নিয়ে এলাম। অনন্তকে পাঠিয়ে দিলাম সিঁড়ির নীচে, হেনা খাবার ঘরেই শুলো। তুমি তো কিছুই দেখনি। ভোঁসভোঁস করে ঘুমোচ্ছিলে। সব আমাকেই করতে হয়।

আমি জেগে উঠেছিলাম, ইচ্ছে করেই কিছু বলিনি।

কেন?

বলে বিপদে পড়ি আর কি! যুবতী ঝি সম্পর্কে সমবেদনা দেখালেই বিপদ।

তোমার খালি বাজে কথা।

বাজে কথা? আমাদের অফিসের নীহারদার কী অবস্থা হয়েছিল জানো?

নীহারদাদের বাড়িতে এই রকম বয়সের একটি মেয়ে কাজ করত। স্বাস্থ্য-টাস্থ ভালো। নীহারদা একদিন বৌদিকে বললেন, মেয়েটাকে একটা শাড়ি কিনে দাও। বড্ড ছেঁড়া শাড়ি পরে থাকে, উঠতি বয়সের মেয়ে—বড্ড চোখে লাগে। ব্যাস, বৌদি

অমনি দপ্ করে জ্বলে উঠলেন।—উঠ্তি বয়সের মেয়ে, ছেঁড়া শাড়ি পরে থাকে, তুমি বুঝি সব সময় ড্যাবড্যাব করে ওর দিকে তাকিয়ে দেখ ? বড্ড যে দরদ ওর জন্য ! শাড়ি কিনে দাও ! তুমি আমার একটা শাড়ি কেনার কথা তো কখনও মুখে আনো না।

প্রমিতাকে হাসতে দেখে শৈবাল বলল, হাসছ কি ? ব্যাপার কত দূর গড়িয়েছিল জানো ? ঐ একটা কথার জন্য নীহারদার প্রায় বিবাহ বিচ্ছেদের উপক্রম। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সেই মেয়েটিকে তো সেইদিনই ছাড়িয়ে দেওয়া হল বটেই, তা ছাড়াও বৌদির মেজাজ ঠাণ্ডা করার জন্য নীহারদা তাঁকে কাশ্মীর বেড়াতে নিয়ে গেলেন সেই মাসেই। পরে নীহারদা আমাদের কাছে আফসোস করে বলেছিলেন, ভাই, একটা কথার জন্য সাত হাজার টাকা খরচা ! নাক কান মুলেছি। আর কক্ষনো বাড়িতে কমবয়েসী ঝি কিংবা রাঁধুনী রাখব না।

প্রমিতা বলল, যেমন তোমার নীহারদা, তেমন তোমার বৌদি ! আজকাল কেউ এত মাথা ঘামায় না এ সব নিয়ে। যে সব মেয়েরা স্বামীকে সন্দেহ করে, তারা কখনো জীবনে সুখী হয় না।

খুব ভালো কথা। তা বলে ও মেয়েটিকে যেন আমাদের বাড়িতে রেখো না।

কেন, তোমার ভয়ে ? তোমার ওপর এটুকু অন্তত আমার বিশ্বাস আছে।

শুনে খুব সুখী হলাম। কিন্তু বাড়িতে ক'জন লোক রাখবে ?

না না, ওকে রাখব না। বললাম তো, ওকে দিদির বাড়িতে পাঠিয়ে দেব। দিদির খুব অসুবিধে হচ্ছে।

শৈবাল বেরিয়ে যাবার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত প্রতিমার অখণ্ড অবসর। মেয়ে স্কুল থেকে ফেরে সাড়ে তিনটের সময়। তার আগে পর্যন্ত আর প্রতিমার কিছু করবার নেই। এক একদিন সে নিজেও বেরিয়ে পড়ে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শৈবাল চট করে প্রতিমার গালে ঠোঁট ছুঁইয়ে বলল, আজ তা হলে তোমার অ্যাডভেঞ্চার দিদির বাড়িতে ?

প্রতিমা হাসল।

অফিস থেকে ফিরে শৈবাল দেখল, ঠিক আগের দিনের মতনই বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে সেই মেয়েটি।

শৈবাল প্রতিমার দিকে প্রশ্নসূচক ভুরু তুলল।

হল না !

কেন ?

প্রমিতা বলল, দিদি ঠিক কালই একজন লোক পেয়ে গেছে। একজনকে বলে একটি ছেলেকে আনিয়েছে ক্যানিং থেকে। হুট করে তো আর তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া যায় না—

তাহলে ?

বাবারে বাবাঃ ! তোমাকে অত চিন্তা করতে হবে না। আমি দেখছি, একটা কিছু ব্যবস্থা করছি।

আমাকে চিন্তা করতে হবে না তো ? বেশ ভালো কথা !

হাত মুখ ধুয়ে জলখাবার-টাবার খেয়ে শৈবাল আবার অফিসের কাগজ-পত্র নিয়ে বসেছে, এই সময় প্রমিতা বলল, এখনো অফিসের কাজ ? বাড়িতে এসেও নিস্তার নেই ? অফিস কি তোমাদের মাথাটাথা সব কিনে রেখেছে নাকি ?

কাগজগুলো মুড়ে শৈবাল বলল, ঠিক আছে, সব সরিয়ে রাখলাম। সত্যিই এত কাজ করার কোন মানে হয় না।

তোমার সঙ্গে আমার একটু আলোচনা আছে।

বল—

মেয়েটিকে নিয়ে কী করি বল তো। দিদির বাড়ি থেকে ফিরিয়ে আনার পর খুব কান্নাকাটি করছিল। দেশে গেলে খেতে পাবে না। ওর বাবা ওকে বাড়িতে জায়গা দেবে না, তাহলে ও যাবে কোথায় ?

এই যে তখন বললে, আমাকে এ নিয়ে কিছু চিন্তা করতে হবে না ?

তা বলে তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শও করা যাবে না ?

অর্থাৎ আমাদের বাড়িতেই রাখতে চাইছ ?

একটা দুঃখী মেয়ে, তাকে তাড়িয়ে দেব ?

দেশে এ রকম লক্ষ লক্ষ গরীব দুঃখী আছে। তাদের সবাইকে কি আমরা সাহায্য করতে পারব ?

তুমি এ রকম নিষ্ঠুরের মত কথা বলছ কেন ? লক্ষ লক্ষ মানুষের কথা কি বলেছি ? অন্তত যেটুকু আমাদের সাধ্য।

একটা ছেলে হলে বলতাম, রেখে দাও। কিন্তু একটি মেয়ে, দেখতে খুব খারাপ নয়। এদের নিয়ে ঝামেলা আছে। শেষে তোমার সঙ্গে আমার না ঝগড়া বেধে যায়।

আ হা হা হা ! ও কথা বারবার বলছ কেন বল তো ! তোমাকে আমি খুব ভালই চিনি। তোমার অনেক সুন্দরী সুন্দরী বান্ধবী আছে। তুমি মোটেই একটা ঝি মেয়ের

ওপর নজর দেবে না, আমি জানি।

বেশ, ভালো কথা। তাহলে তোমার যা ইচ্ছে করো।

যা ইচ্ছে করো মানে ?

রাখতে চাও রাখো, না রাখতে চাও ট্রেনে চাপিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দাও !

আমি ওকে রাখার কথা ভাবছি না অবশ্য। শুধু যে ক'দিন অন্য কোথাও কাজ না পায়। আশ্চর্য ব্যাপার। এক এক সময় কতজন যে কাজের লোক চেয়ে আমাকে বিরক্ত করে। অথচ এখন একজনও ওকে নিতে চাইছে না।

বোধহয় মেয়েটা অপয়া।

যাঃ বাজে কথা বোলো না। মেয়েটাকে দেখলে আমার খুব মায়া হয়।

শোন প্রমিতা, তোমাকে কয়েকটা সত্যি কথা বলব ? মেয়েটাকে দেখলে তোমার মায়া হয়, কিন্তু ও তোমার বাথরুমে ঢুকলে তোমার গা ঘিনঘিন করে। তোমাদের মায়া-দয়াগুলো একটুখানি গিয়েই দেয়ালে ধাক্কা খায়। যদি সত্যিই তোমার মায়া হয় মেয়েটাকে দেখে, তাহলে ওকে ঝি-গিরি করতে পাঠানো কেন ? তোমার গয়না বিক্রি করে কিংবা আমার অফিসের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা ধার করে ওর একটা বিয়ে দিয়ে দেওয়া উচিত না ? তাহলেই ও ভালোভাবে বাঁচতে পারবে।

তোমার যত সব অদ্ভুত কথা। আমরা ওর বিয়ে দিতে যাব কেন ? কাজের জন্য এসেছে, কাজ জুটিয়ে দিয়ে সাহায্য করতে পারি বড় জোর।

তাহলে তাই কর। এতে তো আমার কাছে পরামর্শ চাইবার কিছু নেই।

প্রমিতা উঠে যেতেই আবার অফিসের কাগজ-পত্র খুলে বসল শৈবাল।

আরও দু'দিন মেয়েটি থেকে গেল এ বাড়িতে। কাপড় কেচে দিয়ে, ঘরের ঝুল ঝেড়ে টুকিটাকি সাহায্য করতে লাগল প্রমিতাকে। মেয়েটি লাজুক, কথা খুব কম বলে।

তৃতীয় দিনে ঠিক দৈববাণীর মতন এলো প্রমিতার বান্ধবী ইরার টেলিফোন। সেদিন শৈবালের ছুটি, সে-ই ধরেছিল টেলিফোনটা। দু-একটা কথা বলেই ইরা জানাল—দেখুন না, এমন মুশকিলে পড়ে গেছি, আমাদের রান্নার মেয়েটি হঠাৎ দেশে চলে গেল, আর ফেরার নাম নেই।

শৈবাল হাসতে হাসতে বলল, সেইজন্যই মনে পড়েছে তো আমাদের কথা ! আমাকে রাখবেন ? আমি কিন্তু মন্দ রান্না করি না।

ইয়ার্কি করছেন ! আপনারা তো করবেনই, আপনাদের তো চিন্তা করতে হয় না বাড়ির খাওয়া-দাওয়া কী করে চলবে !

বুঝতে পেরেছি, আমাকে আপনার পছন্দ নয়। কিন্তু আজ আমরাই আপনার মুশকিল-আসান।

তার মানে ?

আপনাকে আমরা আজই রেডিমেড রান্নার লোক দিতে পারি। ধরুন, আমি প্রমিতাকে ডাকছি।

প্রমিতা টেলিফোন ধরে বলল, হ্যাঁ, তোকে দিতে পারি একটি মেয়ে। কিন্তু এ বাড়ির কাজ-টাজ করে, রান্নার কাজ ঠিক পারবে কি না জানি না।

ওপাশ থেকে ইরা বলল, ওতেই হবে। মেয়ে যখন কিছু না কিছু রান্না নিশ্চয়ই জানে। মেয়েটা তোদের বাড়িতেই আছে, ধরে রাখ, কোথাও যেতে দিস না, আমি এক্ষুণি আসছি।

প্রমিতা হাসতে হাসতে বলল, ধরে রাখতে হবে না। ক'দিন ধরে আমার বাড়িতেই আছে।

ইরা বলল, না বাবা, বিশ্বাস নেই। কতজনই তো লোক দেবে বলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী যেন গোলমাল হয়ে যায়। আমার ভীষণ দরকার, বাড়ি সামলাতে আমি হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। এদিকে আমার গাড়িটাও ক'দিন ধরে খারাপ। আমি এক্ষুণি তোর বাড়িতে আসছি ট্যাক্সি নিয়ে।

ইরার স্বামী অফিসের কাজে কুয়ালালামপুর গেছে ছ'মাসের জন্য। ইরা নিজেও একটা কলেজে পড়ায়। বাড়িতে একটি বাচ্চা। রান্নার লোক না থাকলে তার অসুবিধে হয় খুবই। ওদের বাড়িটাও খুব বড়। অত বড় বাড়ি রোজ ধোওয়া-মোছা করাও সহজ কথা নয়।

আধঘন্টার মধ্যে এসে হাজির হল ইরা। তারপর শুরু হল ইন্টারভিউ।

মিনিট দশেক জেরার পর ইরা জিজ্ঞেস করল শেষ প্রশ্নটি ঃ কত মাইনে নেবে ?

হেনা মুখ নীচু করে চোখ খুঁটতে খুঁটতে বলল, সে আপনি যা দেবেন।

ইরা প্রমিতাকে জিজ্ঞেস করল, হাউ মাচ শী এক্সপেক্টস ?

প্রমিতা বলল, ঠিক আছে, হেনা, তুই একটু রান্নাঘরে যা। আমি দিদিমণির সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছি।

হেনা চলে যেতেই প্রমিতা তার বান্ধবীর কানে কানে বলল, মেয়েটার সব ভালো, কিন্তু ভাত খায় বড্ড বেশী। এই অ্যা-ত-খা-নি !

ইরা হেসে বলল, তা খাক না যত খুশি ভাত। আমাদের চারখানা রেশান কার্ড। আমরা তো রেশনের চাল খাই না, সে সব ও একাই খেতে পারবে। ভাতে আর

কত খরচ ! কত মাইনে দেওয়া যায় বল তো ?

মেয়েটা দারুণ অভাবে পড়ে এসেছে। যা পাবে তাতেই খুশি হবে।

কুড়ি ?

কুড়িটা বড্ড কম হয়ে যায়, আজকাল অত কম দিলে লোক টেকে না।

আমি আর একটু বেশী দিতে রাজি আছি। কিন্তু কাজ না দেখে প্রথম থেকেই বাড়ালে—

অত কম দিলে কি হবে জানিস, অন্য বাড়ি থেকে ভাঙিয়ে নিয়ে যাবে। ঝি-চাকররা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে ঠিক জেনে যায়, কোন্ বাড়িতে কে কত মাইনে দেয়।

তবে কত দেব, পঁচিশ ?

আমরা অনন্তকে পঁয়তাল্লিশ দিই।

তোদের ছেলেটা তো হীরের টুকরো....চমৎকার রান্না করে, সেই যে সেবার খেয়ে গেলাম। ওকে পেলে আমি তো এক্ষুণি পঞ্চাশ টাকা দিয়ে নিয়ে যেতে রাজি আছি। তোরা মেয়েটাকে রাখ, আমি অনন্তকে নিয়ে যাই—

আ-হা-হা ! না রে ইরা, আমি বলছি, এও বেশ কাজ করতে পারবে, চটপটে আছে, কথা শোনে।

খুব একটা রোগা পাতলা নয়, খাটতে পারবে আশা করি।

শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে !

আমার যে ছাই শেখাবার সময় নেই। সামনের মাসে দিল্লিতে একটা সেমিনারে যাবো, তার জন্য পেপার লেখা এখনো শেষ হয় নি...সেটা লিখবো, না বাড়ির রান্নার কথা ভাববো !

শেষ পর্যন্ত ইরা পঁয়ত্রিশ টাকা দিতে রাজি হল।

চোখের সামনে একটা খবরের কাগজ মেলে পাশে বসে সব শুনছিল শৈবাল। তার মনে হচ্ছিল, ঐ হেনা মেয়েটি যেন ক্রীতদাসী, ইরা যেন ওকে কিনতে এসেছে। দরদাম করছে প্রমিতার সঙ্গে। এ ব্যাপারে হেনার যেন কিছুই বক্তব্য নেই।

প্রমিতা হেনাকে ডেকে বলল, এই দিদিমণি তোকে পঁয়তিরিশ দিতে রাজি হচ্ছেন। দিদিমণি খুব ভালো, নিজের বাড়ির মতন থাকবি। কেমন ?

হেনা ঘাড় হেলাল।

ইরা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চল, আজ থেকেই শুরু করতে হবে। বাড়িতে রান্নাবান্না কিছু হয়নি। রান্নাগুলো প্রথম দু-একদিন আমি একটু দেখিয়ে দেব। শিখে নিতে

পারবে তো ?

হেনা আবার ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

ওরা চলে যাবার পর শৈবাল বলল, যাক্ নিশ্চিন্ত।

প্রমিতা বললো, ইস, তোমার যেন কতই না দুশ্চিন্তা ছিল !

ছিল বৈকি ! দু'দিন ধরে আমাদের অনন্তকে কী রকম যেন গম্ভীর দেখছি। ও বোধ হয় বাড়িতে অন্য একজন কাজের লোকের উপস্থিতি পছন্দ করছে না।

মোটেই না, আমাদের অনন্ত খুব ভালো ছেলে। কাল মাছ একটু কম পড়েছিল, অনন্ত নিজে না খেয়ে হেনাকে এক টুকরো মাছ দিয়েছে।

শৈবাল ভুরু তুলে সকৌতুকে বললো, তাই নাকি।

কিন্তু ঠিক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল না। দু'দিন বাদেই সকালে ফোন করল ইরা। সকাল বেলা প্রমিতার দারুণ ব্যস্ততা, ফোন ধরারও সময় নেই।

ইরা বলল, তুই কি একটা গাঁইয়া মেয়েকে দিয়েছিস ! গ্যাসটা পর্যন্ত নেভাতে জানে না !

প্রমিতা একটু বিরক্ত হয়ে বলল, তুই তো ভালো করে জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করে দেখে-শুনে নিলি। আমি কি তোকে জোর করে দিয়েছি !

এরা যে এত বোকা হয়, কে বুঝবে বল ! আমি কত করে সব দেখিয়ে শুনিয়ে কলেজে চলে গেলাম। বিকেলে ফিরে এসে দেখি গ্যাস জ্বলছে। বোঝ, সারাদিন গ্যাস জ্বলেছে। এ রকম হলে তো দু'দিনেই সর্বস্বান্ত হয়ে যাব।

আমি তো বলেই দিলাম, মেয়েটি রান্নার কাজ ঠিক জানে না।

এত বড় একটা বুড়ো ধাড়ী মেয়ে, বাড়িতে কি ও কখনও রাঁধেনি ? জানে না যে উনুন নেভাতে হয় ?

খাবার টেবিল থেকে শৈবাল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তুমি কতক্ষণ ফোনে এই সব গল্প চালাবে ? আমাকে খেতে-টেতে দেবে না ?

প্রমিতা সে কথা শুনতেই পেল না। মানুষের দুটো কান থাকলেও অনেক সময়ই মানুষ একসঙ্গে দু'রকম শব্দ শুনতে পায় না। তাছাড়া প্রমিতার মনটা একমুখী। একটা দিকে যখন সে মন দেয় তখন, অন্য দিকে হঠাৎ আগুন লেগে গেলেও সে ফিরে তাকাবে না।

অনন্তর কাছ থেকে খাবার চেয়ে নিয়ে শৈবাল যখন প্রায় শেষ করে এনেছে সেই সময় প্রমিতা ফিরে এলো খাবার টেবিলে। শৈবাল খানিকটা রুক্ষ গলায় বলল, তাহলে মেয়েটা আবার আমাদের এখানে ফিরে আসবে ?

কোন্ মেয়েটা ?

ঐ তোমার হেনা—যাকে তোমার বান্ধবীর বাড়িতে কাজ দিয়েছ ?

না, না, ফিরে আসবে কেন ? ইরার ভীষণ কাজের লোক দরকার।

তাহলে হেনার কাজের যাবতীয় সমালোচনা তোমাকে শুনতে হবে কেন ? ও কাজে ভুল করলে সে দায়িত্ব কি তোমার ?

সে কথা কে বলেছে ?

তোমার বান্ধবী তো এতক্ষণ যাবতীয় অভিযোগ তোমাকেই শোনাচ্ছিল ! যে রান্না করতে জানে না, তাকে দিয়ে জোর করে রান্না করাবে, আবার অভিযোগও করবে।

তুমি রেগে যাচ্ছ কেন ?

আমার এ সব একদম পছন্দ হয় না। গ্রামের মেয়ে, কোন দিন গ্যাসের উনুন চোখে দেখেনি, এক দিনেই সব শিখে যেতে পারে ? আমরা আমাদের অফিসের কাজ একদিনে শিখি ?

ইরা ঠিক অভিযোগ করেনি, এমনি মজা করে বলছিল।

গরীবদের নিয়ে মজা করাটাও আমার ভালো লাগে না। আমি বলে রাখছি দেখো, ঐ মেয়েটি ঠিক আবার ফিরে আসবে এখানে। তোমার বান্ধবী ইরার বাড়িতে কোন লোক টেকে না !

ব্যাপারটা হল অবশ্য তার ঠিক বিপরীত ! রাত্রিবেলা ফিরে শৈবাল দেখল অন্য দৃশ্য। রান্নাঘরের দরজা খোলা। কোমরে আঁচল জড়িয়ে যেখানে মহা উৎসাহে রান্নায় মেতে আছে প্রমিতা, তার সারা মুখে চন্দনের ফোঁটার মতন ঘাম।

শৈবাল উঁকি দিয়ে বলল, কি ব্যাপার ?

প্রমিতা বলল, আজ তোমার জন্য চিলি চিকেন রান্না করছি। দেখ, দোকানের চেয়েও ভালো হয় কি না !

বিয়ের পর প্রথম দু-এক বছর প্রমিতা মাঝে মাঝে নিজের হাতে কিছু কিছু রান্না করেছে। তার রান্নার হাতটা ভালোই। কিন্তু সে-সব শখের রান্না। ঠিক গিন্নি-বান্নীদের মতন সে নিয়মিত রান্না করতে ভালোবাসে না। সে ভালোবাসে রবীন্দ্রসঙ্গীত, এখানে সেখানে বেড়াতে যাওয়া, বন্ধুদের সঙ্গে হৈচৈ, বাংলা গল্পের বই এবং ঘুম। ঘুমের মতন প্রিয় আর কিছুই নেই প্রমিতার কাছে।

প্রমিতা বলল, আজ বিশেষ কিছু নেই কিন্তু। ভাত, ডাল, আলুসেদ্ধ আর চিলি চিকেন।

শৈবাল বলল, চমৎকার ! আর কি চাই। একেবারে চীনে বাংলা সংমিশ্রণ !

খেতে বসেও যখন দেখা গেল প্রমিতাই পরিবেশন করছে, তখন শৈবাল জিজ্ঞেস করল, অনন্ত কোথায় ?

প্রমিতা বলল, অনন্তর জ্বর হয়েছে। দুপুর থেকেই হঠাৎ খুব জ্বর এসেছে।

ও, সেইজন্যই বাধ্য হয়ে তোমাকে রান্না করতে হয়েছে ? তাই বল !

মন্দ লাগল না। মাঝে মাঝে রাঁধতে ভালোই লাগে। মাঝে মাঝে অভ্যেসটাও রাখা ভালো।

ভাগ্যিস আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছিলাম। আজ দেরি করে ফিরলে নিশ্চয়ই একটা কেলেঙ্কারি হতো !

আজ তুমি রাত বারোটা বাজিয়ে ফিরলে এইসব রান্না-বান্না ফেলে দিতুম আঁস্তাকুড়ে !

সেটা দেশের পক্ষে খুবই ক্ষতি হতো ! একে তো দেশে খাদ্যাভাব, তার ওপরে এত ভালো রান্না....

তোমার পছন্দ হয়েছে ?

দারুণ ! হঠাৎ যদি এরকম সারপ্রাইজ দাও, তাহলে রোজই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবো।

আহা-হা-হা

অনন্তকে কোন ওষুধ দিয়েছ ?

একদিনের জ্বর, কি আর দেব। বোধ হয় ঠাণ্ডা লেগেছে, সেদিন ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে বাইরে শুয়েছিল তো।

শৈবাল বললে, সত্যি তোমার রান্না খুব ভালো হয়েছে। দোকানের চেয়ে অনেক ভালো। তোমাকে এ জন্য একটা প্রাইজ দেওয়া দরকার।

রান্নার প্রশংসা শুনলে সব মেয়েই খুব খুশি হয়। প্রমিতা বেশ ভালো মেজাজে অনেকক্ষণ গল্প করল খাওয়ার পর। তারপর বিছানায় শুয়ে সে রাতটা এদের বেশ ভালোই কাটল।

॥ তিন ॥

প্রমিতার মেয়ে বাবলির জন্মদিন আগস্টের সাত তারিখ, আর ইরার ছেলে পিকলুর জন্মদিনও ঠিক সেই দিন। সুতরাং দুই বান্ধবীই এই তারিখটা খুব খেয়াল রাখে।

এ বছর আট তারিখ রবিবার। শনিবার ঈদের ছুটি। চমৎকার ব্যাপার। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, এ বছর ঐ সময় দুটি পরিবারই একসঙ্গে বেড়াতে যাবে ডায়মণ্ডহারবার, সেখানেই একসঙ্গে জন্মদিনের উৎসব হবে পিকলু আর বাবলির।

ডারমণ্ডহারবারে ইরার মামাদের বাড়ি ফাঁকা পড়ে আছে। সেখানে অনায়াসে যাওয়া যায়। শনিবার সকালে গিয়ে রবিবার সন্ধের পর ফিরে আসা।

ইরার স্বামী ট্রেনিং-এর জন্য গেছে কুয়ালালামপুরে। সুতরাং প্রমিতার স্বামী শৈবালকেই সব ব্যবস্থার ভার নিতে হবে, সেটাই স্বাভাবিক। তবু শৈবালের মন খুঁতখুঁত করে।

বেড়াতে যে ভালোবাসে না শৈবাল, তা নয়। ডারমণ্ডহারবারে উইক-এণ্ড কাটিয়ে আসা তো বেশ ভাল প্রস্তাব। কিন্তু ইরার সঙ্গে কি পাল্লা দিয়ে পারা যাবে। ইরা মুঠো মুঠো টাকা খরচ করে, টাকা-পয়সার হিসেবেরই ধার ধারে না সে। অথচ, পুরুষ সঙ্গী হিসেবে শৈবালেরই খরচ করা উচিত বেশী। কিন্তু শৈবালের হাতে টাকা জমে না। কী একটা কারণে যেন দু'তিন মাস ধরে বেশ টানাটানি চলছে।

পাঁচ তারিখে অফিসে বেরুবার মুখে শৈবাল বলল, কালই হয়তো আমায় একবার এলাহাবাদ যেতে হতে পারে।

প্রমিতা অবাক। এলাহাবাদ? সে কি! একদিনের মধ্যে গিয়ে ফিরে আসা যায় নাকি?—কাল এলাহাবাদ যাবে মানে? কবে ফিরবে?

গেলে রবিবার রাত্তিরের আগে কি আর ফেরা যাবে?

তার মানে? আমাদের ডায়মণ্ডহারবার যাওয়া সব ঠিকঠাক।

কিন্তু অফিসের কাজ পড়লে কি না বলা যায়?

সাত-আট তারিখে তোমার ছুটি। তার মধ্যেও অফিসের কাজ?

আমাদের কি আর ছুটি বলে কিছু আছে?

কেন? তুমি এলাহাবাদে সোমবার যেতে পারো না?

একটা জরুরী টেণ্ডারের ব্যাপার আছে, জি. এম. বলছিলেন...

প্রমিতা রাগে মুখখানা গনগনে করে তাকাল স্বামীর দিকে। রাগ কিংবা আনন্দ কিবা দুঃখ সবগুলিই প্রমিতার খুব তীব্র। সঙ্গে সঙ্গে মুখে তার ছাপ পড়ে।

আমাদের নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাবার কথা উঠলেই তোমার কাজ পড়ে যায়। আমি প্রত্যেকবার দেখেছি। তার মানে তুমি আমাদের নিয়ে যেতে চাও না।

না না, আমারও তো খুব ইচ্ছে, দেখি অফিসে আজ একবার বলে—

কোন দরকার নেই। আমি ইরাকে ফোন করে বলে দিচ্ছি, যাওয়া হবে না!

আরে আরে, হঠাৎ রেগে যাচ্ছ কেন ? যাওয়া বন্ধ করবে কেন ? যাওয়া হবেই, বাচ্চারা আশা করে আছে, আমি যদি না-ও যাই, তোমরা যেতে পারবে না ?

এই বাচ্চাদের নিয়ে আমরা শুধু মেয়েরা যাব ?

আজকাল স্ত্রী স্বাধীনতার যুগে—পুরুষদের বাদ দিয়ে তোমরা কোথাও যেতে পারবে না ? তোমার বান্ধবী ইরা খুবই এফিসিয়েন্ট—

প্রমিতা ঢুকে গেল রান্নাঘরে। একটু পরেই দুধ পোড়ার গন্ধে ভরে গেল সারা ফ্ল্যাট। অনন্তকে দোকানে পাঠানো হয়েছে, যাবার সময় সে বলে গিয়েছিল, বৌদি গ্যাসটা বন্ধ করে দেবেন কিন্তু—

এই রকম কোন ব্যাপার হলেই প্রমিতা তার স্বামীকে দায়ী করে।

তোমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়েই তো দুধটা পুড়ে গেল। অন্য দিন হলে রাগতভাবে এই কথাটা বলত প্রমিতা। আজ কিছুই বলল না, দাঁড়িয়ে রইল রান্নাঘরে। সুতরাং শৈবাল বুঝল, অবস্থা খুব গুরুতর।

অনেক গোপন কথা থাকে, যা নিজের স্ত্রীকেও বলা যায় না।

গত বছর কোলাঘাট বেড়াতে গিয়ে ডাব খাওয়া হয়েছিল। ছ'খানা ডাবের দাম ডাবওয়ালা চেয়েছিল ন'টাকা। যদিও সাইজ বেশ বড় ছিল, তবু দেড় টাকা করে একটা ডাব ? এ তো দিনে ডাকাতি ! গাড়ি-চড়া বাবু আর বিবিদের দেখে লোকটা যা খুশি দাম হাঁকিয়েছে।

ইরাকে দাম দিতে দেয়নি শৈবাল, সে নিজেই টাকা বার করেছিল, অনেক দর কষাকষি করে রফা হল সাত টাকায়। শৈবাল দাম মিটিয়ে দেবার পর ইরা বলেছিল, বাবাঃ, আপনি দরাদরিও করতে পারেন বটে ! বেচারার মুখখানা কেমন করুণ হয়ে গেছে। তারপর নিজের হ্যাণ্ড-ব্যাগ থেকে একটা দু'টাকার নোট বার করে ডাবওয়ালার দিকে এগিয়ে দিয়ে ইরা বলেছিল, এই নাও, তোমারই বা আর মনে দুঃখ থাকে কেন ?

সেদিন খুব অপমানিত বোধ করেছিল শৈবাল। সামান্য দু'টাকার জন্য নয়, লোকটি তাকে ঠকাচ্ছে বুঝতে পেরেই সে সাত টাকা দিয়েছিল। তারপর ইরার ঐ রকম ভাবে টাকা দেওয়া কি ঠিক হয়েছে ?

সে রাত্রে শৈবাল স্ত্রীকে বলেছিল, তোমার বান্ধবী ইরা বড্ড চালিয়াৎ। তখন ও ঐ ডাবওয়ালাকে হঠাৎ আবার টাকা দিতে গেল কেন ?

প্রমিতা অবাক হয়ে উত্তর দিয়েছিল, ও মা, সে কথা তুমি মনের মধ্যে পুষে রেখেছ ? একটা গরীব ডাবওয়ালাকে সামান্য দু'টাকা যদি বেশী দিয়েই থাকে, তাতে কি হয়েছে ? মাঝে মাঝে তুমি এত কৃপণ হয়ে যাও—

শৈবাল হল কৃপণ ? কোলাঘাটে বেড়ানো উপলক্ষে শৈবাল যে আড়াইশো টাকা খরচ করল, সেটা কিছু নয় ? আর ডাবওয়ালাকে ন্যায্য দাম দিতে গেছে বলেই সে কৃপণ হয়ে গেল ? শৈবাল নিজে ভাল করেই জানে সে কৃপণ নয়। কিন্তু বিনা কারণে পয়সা নষ্ট করতে তার গায়ে লাগে।

অফিস থেকে সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরতেই বাবলি বলল, বাবা, আমাদের ডায়মণ্ডহারবার যাওয়া হবে না ? কেন যাওয়া হবে না ? মা বলছিল—

মেয়েটার মুখ দেখেই ধক্ করে উঠল শৈবালের বুকের মধ্যে। কত আশা করেছিল ওর জন্মদিন উপলক্ষে পিকনিক হবে। ওর মনে আঘাত দিতে পারবে না শৈবাল।

ন'বছর বয়েস বাবলির। মায়ের চেয়ে বাবাকে বেশী ভালবাসে। ওর ছোট ভাই রিন্টু মায়ের বেশী প্রিয়। বাবলিকে কাছে টেনে নিয়ে শৈবাল বলল, হ্যাঁ, যাওয়া হবে, আমি অফিসে ব্যবস্থা করে এসেছি—

আসলে এলাহাবাদে যাওয়ার কথা ওর সহকর্মী চক্রবর্তীর। শৈবাল ভেবেছিল, চক্রবর্তীকে অনুরোধ করে তার বদলে ও নিজেই যাবে।

প্রমিতার মুখে এখনও রাগ রাগ ভাব। সে বলল, না, আমরা যাব না। দুপুরে ইরা এসেছিল, তাকে আমি বলে দিয়েছি, আমাদের যাওয়া হচ্ছে না, ইচ্ছে করলে ও একলা যেতে পারে।

হাল্কা গলায় শৈবাল বলল, ইরাকে ফোন করে দাও। বল যে আমাদের আবার যাওয়া ঠিক হয়েছে।

ইরাদের ফোন খারাপ।

তা হলে চিঠি লিখে অনন্তকে দিয়ে পাঠাও। কিংবা চল, আমরাই এখন বেড়াতে বেড়াতে যাই ইরার কাছে। এক্ষুণি সব ঠিকঠাক করে আসি।

আস্তে আস্তে প্রমিতার মুখের রং বদলাতে লাগল। শৈবালের সব তাতেই হাসি ঠাট্টা। কোন্‌টা যে কখন সীরিয়াস ভাবে বলে, তা বোঝাই যায় না।

যাওয়া হবে ইরার গাড়িতে। অনেক দিন বোম্বেতে ছিল, খুব ভাল গাড়ি চালায়। ওর গাড়িতেই ছ'জন ধরে যাবে।

শৈবাল বলেছিল, ট্রেনে যাওয়াই তো ভাল। ডায়মণ্ডহারবারে ট্রেনে যেতে কোন অসুবিধেই নেই। ঘন্টা দেড়েকের জার্নি।

কিন্তু ইরা গাড়ি ছাড়া কোথাও এক পা যেতে পারে না। তাছাড়া ডায়মণ্ডহারবার থেকে এদিক ওদিক একটু বেড়াতে হলে গাড়ি লাগবে। ইচ্ছে হলে কাকদ্বীপ কিংবা নামখানা ঘুরে আসা যায়। গাড়ি যখন আছেই, তখন নিতে আপত্তি কি ?

ঠিক আপত্তিটা যে কি, তা ঠিক খুলে বলা যায় না।

গাড়ি চালাবে ইরা, শৈবালকে তার পাশে বসতে হবে। আজকাল অনেক ব্যাপারেই নারী ও পুরুষ সমান। মেয়েরাও আজকাল হাইকোর্টে জজ্ হয়, তা ঠিক। তবু একটি মেয়ে গাড়ি চালাচ্ছে, আর একজন পুরুষ তার পাশে বসে আছে, এটা দৃষ্টিকটু লাগে। এখানে আমাদের এই দেশে রাস্তার লোকে অবাক ভাবে তাকিয়ে দেখে।

প্রমিতা নিজেই তো একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল, ইরা সব সময় আমাদের নিয়ে যায়....তুমি গাড়ি চালানোটা শিখে নিতে পারোনি। তোমাদের অফিসে তো কত গাড়ি !

এ রকম কথা শুনলে শৈবালকে শুধু বোকার মতন একটু হাসতে হয়, কোন উত্তর দেওয়া যায় না। গাড়ি চালানো শিখলেই বা কী হত ? গাড়ির ব্যাপারে ইরা দারুণ খুঁতখুঁতে, স্টিয়ারিং-এ অন্য কারুকে হাত দিতে দেয় না। সেইজন্যেই তো ড্রাইভার রাখতে চায় না ইরা।

ইরা বলল, ওর বাড়িতে যে মেয়েটি কাজ করে, সেই হেনাকে নিয়ে যাওয়া হবে।

কেন ?

বাঃ, ওখানে আমার মামাবাড়িতে শুধু তো একজন দারোয়ান আছে, আর তো কেউ নেই। রান্নাবান্না, মসলা বাটা, তরকারি, মাছ কোটা—এ সব কে করবে ?

প্রমিতা বলল, তাহলে তো আমাদের অনন্তকে নিয়ে গেলে হয়। ও তো ফ্ল্যাটে একলাই থাকবে। তার বদলে ও বরং আমাদের সঙ্গে চলুক !

কিছুদিন ধরে অনন্ত প্রায়ই জ্বরে পড়ছে। বাড়িতে যে-সব টুকিটাকি ওষুধ থাকে, প্রমিতা তাই দেয়। একটু কমে কদিন পরে আবার জ্বর আসে।

সে জ্বর গা নিয়েই কিন্তু অনন্ত কাজ করে, বাজারে যায়। বারণ করলেও শোনে না। ছেলেটা সত্যিই খুব ভালো।

প্রমিতা জিজ্ঞেস করলো, কী রে, অনন্ত, তুই যাবি আমাদের সঙ্গে ডায়মণ্ডহারবার ?

অনন্ত ঘাড় হেলিয়ে জানাল, হ্যাঁ।

শরীর ঠিক আছে তো ?

হ্যাঁ।

ইরা বলল, অনন্ত গেলে আরও ভাল হয়। ও তো খুব কাজের ছেলে।

এই প্রস্তাব শুনে শৈবাল খুব খুশি। গাড়িতে এত আঁটবে না। তাহলে মেয়েদের আর বাচ্চাদের ইরার গাড়িতে তুলে দিয়ে সে আর অনন্ত ট্রেনে চলে যাবে।

যাওয়ার আগের দিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে প্রমিতাকে একথা জানাতেই সে ফোঁস করে উঠল।—তা কখনো হয়? আজকাল রাস্তায় ঘাটে কত রকম বিপদ আপদ হতে পারে, কিংবা হঠাৎ যদি নিরালা কোন জায়গায় গাড়িটা একেবারে খারাপ হয়ে যায়, তখন ছেলেমেয়েদের নিয়ে...। একজন পুরুষমানুষ সঙ্গে না থাকলে কি চলে?

ইরা যতখানি স্ত্রী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, প্রমিতা ততটা নয় দেখা যাচ্ছে। সে এখনো পুরুষের পরিত্রাতা-ভূমিকাটা পছন্দ করে। তা হলে হেনা আর অনন্ত এই দু'বাড়ির দুই ঝি-চাকরকেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে ট্রেনে।

ইরা সদলবলে পৌঁছে গেল ঠিক সাড়ে পাঁচটায়। ভোরবেলাতেই গাড়ি চালিয়ে আরাম। বেশী বেলায় চিড়বিড়ে রোদ উঠে গেলে বাচ্চাদের কষ্ট হবে।

যথাসময়ে উঠতে পারবে কিনা এই ভয়ে প্রমিতা প্রায় সারা রাতই জেগে ছিল, তবু সে তখনো তৈরি হতে পারেনি। জিনিসপত্র গুছোতেই তার বারবার ভুল হয়ে যায়। শৈবাল তাড়া দিলেই সে বলে, তুমি তো একটুও সাহায্য করতে পারো না!

দারুণ সুন্দর সেজে এসেছে ইরা। ছোট্টখাট্টো মেমসাহেবের মত চেহারা তার, দেখে মনেই হয় না তার বারো বছরের একটি ছেলে আছে। ব্লু জিনের প্যান্টের ওপর পরেছে একটি গোলাপী রঙের পাঞ্জাবি। মাথায় চুল বব্ করা। সেই তুলনায়, পিঠের ওপর চুল ফেলা, একটা গাঢ় নীল রঙের শাড়ি পরা প্রমিতাকে দেখাচ্ছে নন্দলাল বসুর আঁকা ছবির মতন। পোশাকে মিল নেই, তবু এই দুজন দারুণ বান্ধবী।

ইরা বলল, হেনার ট্রেনে যাবার দরকার নেই, শুধু অনন্ত চলে যাক ট্রেনে। হেনার জায়গা হয়ে যাবে এর মধ্যেই।

জায়গা হয়ে যায় ঠিকই, তবে বেশ চাপাচাপি হয়। দু'দিনের পিকনিকের জন্য মালপত্র তো কম নয়।

কিন্তু ইরার কথার প্রতিবাদ চলবে না, আসলে সে-ই দলনেত্রী। পিছনের সীটে প্রমিতা, বাবলি, হেনা আর রিন্টু, সামনের সীটে শৈবালের পাশে পিক্লু।

গাড়িতে উঠলেই রিন্টুর ইচ্ছে হয় অন্য সব গাড়িকে ছাড়িয়ে যেতে। পাশাপাশি অন্য কোন গাড়ি গেলেই সে লাফাতে থাকে, ইরা মাসী, আরও জোরে, ঐ ফিয়াট গাড়িটাকে আগে যেতে দেবে না। আরও জোরে—

জোরে চালাতে ইরার কোন আপত্তি নেই। সে ভুলে যায় যে এটা বোম্বাইয়ের মতন মসৃণ রাস্তা নয়। এটা কলকাতা, যেখানে সেখানে গর্ত। শৈবালের ভয় ভয় করে, কিন্তু মুখে কিছু বলে না। মেয়েরা কেউ যখন আপত্তি করছে না, তখন একমাত্র পুরুষ হয় এ রকম কথা বলা কি তার মানায়? অথচ শৈবাল জানে, সে ভীতু নয়।

তার ভয় এই বাচ্চাগুলোর জন্য।

সে কথায় কথায় রিন্টুকে অন্যমনস্ক করবার চেষ্টা করে।

রিন্টু ফস করে জিজ্ঞেস করে বসল, বাবা, তুমি গাড়ি চালাতে পারো না?

হাসি মুখে দু'দিকে মাথা নাড়ে শৈবাল।

বড় হয়ে আমি কিন্তু গাড়ি চালাব। ইরা মাসী, তুমি শিখিয়ে দেবে না?

ইরা কৌতুক হাস্যে বলল, আমি তোর বাবাকেও শিখিয়ে দিতে পারতুম, কিন্তু তোর বাবার ইচ্ছেই নেই!

প্রমিতা বলল, হ্যাঁ, তুমি তো ইরার কাছ থেকেই গাড়ি চালানো শিখে নিতে পারো। ক'দিনই বা লাগে?

এই আলোচনাটাই একদম পছন্দ হয় না শৈবালের।

গাড়ি খারাপ হল না বটে, কিন্তু আমতলা পেরিয়ে যাবার পর চাকা পাংকচার হল।

সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়ল হুড়মুড়িয়ে। এবার চাকা পাল্টাতে হবে। এটাও পুরুষদের কাজ। রাস্তাঘাটে কোন দিন কোন মেয়েকে চাকা পাল্টাতে দেখেনি শৈবাল।

কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইরা বলল, খাইসে!

ইরা বাঙাল নয়, তবু মাঝে মাঝে বাঙাল কথা বলা তার শখ।

জ্যাকটা টেনে বার করে ইরা গাড়ির নীচে বসাল।

প্রমিতা বলল, এখন তোকেই এ সব করতে হবে নাকি?

ইরা বলল, উপায় কি? কাছাকাছি তো কিচ্ছু নেই।

শৈবাল যা আশঙ্কা করছিল, ঠিক তাই হল। প্রমিতা তার দিকে তাকিয়ে ভর্ৎসনার সুরে বলল, তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ? হাত লাগাতে পারছ না?

শৈবালের বলবার ইচ্ছে হল যে, আমি যখন গাড়ি চালাতেই শিখিনি, তখন শুধু শুধু চাকা-পাল্টানো শিখতে যাব কেন? আমি কি মেকানিক?

কিন্তু এ সব সরল যুক্তির কথা মেয়েদের কাছে বলে কোন লাভ নেই। তার বদলে শৈবাল উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে সমস্যার সমাধান করে দিল খুব সহজে।

উল্টো দিক থেকে একটা খালি লরি আসছিল। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত দেখিয়ে সেটাকে থামিয়ে ফেলল শৈবাল। তারপর ড্রাইভারকে মিনতি করে বলল, ভাই, পাঁচটা টাকা দেব, আমাদের চাকাটা একটু পাল্টে দেবেন?

আট-দশ মিনিট সময় খরচ করে পাঁচ টাকা রোজগার করতে কে না রাজি হয়। ড্রাইভারটি উৎসাহের সঙ্গে নেমে এলো।

ইরাই যে এ গাড়ির চালক, তা বুঝতে পেরে একটু কৌতুকও বোধ করলে ড্রাইভারটি। সে বাঁকা ভাবে দু'একবার তাকালো শৈবালের দিকে।

চাকা পাল্টাবার কাজ চলছে, এরই মধ্যে হাজির হল দুটি ছেলে, তাদের কাছে ডাব। ছুটির দিনে এ পথ দিয়ে অনেক টুরিস্ট যায়, সেইজন্য ডাব নিয়ে এই ছেলের দল সব জায়গায় তৈরি।

ইরা বলল, ভালই হল, ডাব খাওয়া যাক।

শৈবাল প্রমিতার চোখের দিকে তাকাল। কোন ভাষা ফুটল না সেখানে। অর্থাৎ প্রমিতার মনে নেই।

আবার সেই দরাদরির ঝামেলা। মানিব্যাগটা বার করে প্রমিতাকে দিয়ে শৈবাল বলল, তোমরা ডাব খাও—দামটা দিয়ে দিও, আমি একটু আসছি।

খানিকটা এগিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে এমন একটা কাজ সারতে গেল শৈবাল, যে সময় সেদিকে মেয়েদের তাকাতে নেই।

ডায়মণ্ডহারবার পৌঁছতে পৌঁছতে বেজে গেল দশটা। অনন্ত অনেক আগেই এসে দাঁড়িয়ে আছে সাগরিকার সামনে।

ইরার মামাবাড়িটা শহর ছাড়িয়ে একটু বাইরে। খোলামেলা চমৎকার বাড়ি। একতলা-দোতলা মিলিয়ে অনেকগুলো ঘর। এমন বাড়ি ফাঁকা পড়ে থাকে।

দুপুরে এ বাড়িতেই রান্না হবে, না সাগরিকা থেকে খাবার আনানো হবে, তাই নিয়ে সামান্য মতভেদ হল।

এখন বাজার করে রান্না বসাতে বসাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে ঠিকই। তবু শৈবালের মত এই যে, পিকনিক করতে এসে আর দোকানের খাবার খাওয়া কেন ? আসবার পথে ছেলেমেয়েরা তো হেভি ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিয়েছেই।

ইরা বলল, এ বেলা রান্না-বান্নার আর ঝামেলা করে লাভ নেই। ও বেলা হবে।

প্রমিতা বলল, শুধু খিচুড়ি আর মাছভাজা হলে বেশীক্ষণ দেরি লাগবে না। মসলাপাতি আমি সঙ্গে এনেছি।

শৈবাল ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা খিচুড়ি খেতে চাও, না দোকানের খাবার খেতে চাও ? হাত তোল।

ছেলেমেয়েরা সবাই একসঙ্গে হাত তুলে চেঁচিয়ে বলল, খিচুড়ি ! খিচুড়ি !

ইরা বলল, তবে তাই হোক।

হেনাকে পাঠানো হল উনুন ধরাতে। অনন্ত বাজারে যাবে। প্রমিতা তাকে জিনিসপত্রের লিস্ট করে দিতে লাগল।

একটু বাদেই ইরা ঘুরে এসে বলল, এই প্রমিতা, শোন, এর মধ্যেই প্রায় সাড়ে দশটা বেজে গেল, অনন্ত এখন বাজারে যাবে, ফিরে আসবে, তারপর রান্না চাপবে, সে কত বেলা হবে ভেবে দ্যাখ।

শৈবাল বলল, ছুটির দিন, দেড়টা-দুটোর মধ্যে রান্না হলেই তো যথেষ্ট।

ইরা বলল, আপনি বুঝতে পারছেন না.....তার চেয়েও বেশী দেরি হলে..ছোটদের হজম হয় না....তাছাড়া অনেক গরম জল করতে হবে, আমি তো বাইরে কোথাও গরম জল ছাড়া স্নান করি না, পিক্লুকেও গরমজলে...

প্রমিতা বলল, আমি চান-টান সেরে এসেছি।

ইরা বলল, আজ এ বেলা রান্না থাক। অনন্ত, তুমি বরং সাগরিকায় গিয়ে অর্ডার দিয়ে এস, আমাদের যে ক' প্লেট লাগবে বলে দিচ্ছি....আমরা ঠিক একটা পনেরোর মধ্যে খেতে যাব....বাচ্চাদের জন্য পাতলা স্টু, আর....

অর্থাৎ ইরার কথাই শেষ পর্যন্ত থাকবে। অন্যদের মতামতের কোন দাম নেই, ইরা যা বলবে তাই করতে হবে।

শৈবালের চোয়ালটা কঠিন হয়ে গেল একবার।

পরক্ষণেই সে ভাবল, থাক, রান্না করে আর কি হবে। স্ত্রীর বান্ধবী, তার ওপরে সুন্দরী, তার সঙ্গে তো শৈবালের মধুর সম্পর্কই থাকা উচিত। শুধু শুধু মন কষাকষির কোন মানে হয় না, তাও বাইরে বেড়াতে এসে।

ইরার সব কিছু ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায়। ঠিক একটা বেজে দশ মিনিট পর সে গাড়িতে হর্ন দিতে লাগল। এবার খেতে যেতে হবে। বাচ্চারা বাগানে হুটোপাটি করে খেলছিল, তারা সবাই বলল, তাদের এখনো খিদে পায়নি।

শৈবালেরও খিদে পায়নি। আকাশে মেঘ করে আছে, বেলাই হয়নি মনে হয়। কিন্তু সাগরিকার সময় বলে দেওয়া হয়েছে, ইরা আর কাউকে দেরি করতে দেবে না। সবাইকে উঠে পড়তে হল গাড়িতে।

বড় বড় হোটেলে ঝি-চাকরদের মেঝেতে বসে খেতে দেয় না। আবার বাবুদের মতন একই রকম টেবিলে খেতে দিলেও কেমন দেখায়। কিন্তু হেনা আর অনন্তকেও তো খেতে হবে।

শৈবাল জোর দিয়ে বলল, তোমরাও এখানেই বস। তারপর একজন বেয়ারার চোখের দিকে তাকিয়ে হুকুমের সুরে সে বলল, ওরা যা খেতে চাইবে দেবে।

একেবারে পাশাপাশি টেবিল নয়, অনন্ত বেছে নিল একেবারে দূরের এক কোণের একটা টেবিল।

ছেলেমেয়েদের নিয়ে খেতে বসলে তাদের ব্যাপারটাই প্রধান হয়ে ওঠে। বড়দের নিজস্ব কথা বলার কিছু থাকে না। ইরা ও প্রমিতা ছেলেমেয়েদের নিয়ে ব্যস্ত রইল, শৈবাল রইল নিঃশব্দ। একবার দূরে অনন্তদের টেবিলটার দিকে তাকিয়ে তার মনে হয়, সবচেয়ে বেশী উপভোগ করছে ওরাই। দুজনের বয়েস কাছাকাছি, মনে হতে পারে ওরা দুজন প্রেমিক প্রেমিকা, লুকিয়ে লুকিয়ে সাগরিকায় খাচ্ছে। হোক না ওদের পোশাক অতি মামুলি !

ওরা অবশ্য কথা বলছে না বিশেষ, পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে মাঝে মাঝে। অনন্ত এমনিতেই কম কথা বলে।

ইরা ব্যাগ বের করছে দেখে শৈবাল বলল, আমি দিচ্ছি।

ইরা বলল, না না, আজ আমি আপনাদের এনেছি।

যাঃ ! রাখুন তো !

এ কি, সাগরিকায় আমিই জোর করে আপনাদের নিয়ে এলুম।

শৈবাল আর বেশী কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বেয়ারার ট্রের ওপর টপ করে ফেলে দিল একটা একশো টাকার নোট।

বেয়ারাটি শৈবালের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, একশো বারো টাকা, স্যার !

শৈবালের একেবারে আঁতকে ওঠার অবস্থা। একশো বারো টাকা ! ডাকাতি নাকি ? এইতো খাবারের ছিরি ? অনন্ত হেনা বেশী খেয়েছে। না, অনন্ত খুব কম খায়। হেনা তো অর্ডার দেয়নি, ও টেবিলে অনন্তই অর্ডার দিয়েছে, সে কখনো বাবুদের বাজে খরচ করাবে না। ছেলেমেয়েরা দু-একটা ডিম বেশী নিয়ে নষ্ট করেছে অবশ্য।

বাড়িতে খিচুড়ি আর মাছ ভাজা খেলে কত খরচ হত ? পঞ্চাশ ষাট টাকার বেশী কিছুতেই নয়। আর গরম গরম খিচুড়ির সঙ্গে টাটকা ইলিশ মাছ ভাজা, এই দোকানের খাবারের চেয়ে অনেক বেশী উপাদেয় হত না ?

শুধু শুধু এতগুলো টাকা নষ্ট। অথচ এ কথা বলতে গেলেই শৈবাল ওদের চোখে কৃপণ হয়ে যাবে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শৈবাল ভাবল, ছেলেমেয়েরাই সব চেয়ে সুখী। ওদের সব সময় মনে মনে টাকার হিসেব করতে হয় না।

দুপুরবেলা খাটে শুয়ে একটা বই পড়ছিল শৈবাল। ঘরের তো অভাব নেই। তাই শৈবাল একটা আলাদা ঘর নিয়েছে। সব ঘরেই খাট আর গদি পাতা। ইরার স্বামী আসেনি। সেইজন্যই রাতে শৈবাল আর প্রমিতার এক ঘরে শোওয়া ভাল দেখায় না। তার চেয়ে দুই রমণী দু'ঘরে নিজেদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকুক, শৈবাল

আলাদা, সে যেন বাইরের লোক।

বাবলি এসে বলল, বাবা, জানো তো হেনাদিকে পাওয়া যাচ্ছে না।

শৈবাল উঠে বসল।—কী ?

হেনাদি নেই। কোথায় যেন চলে গেছে।

লম্বা টানা বারান্দা, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ইরা আর প্রমিতা।

শৈবাল প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, অনন্ত কোথায় ?

প্রমিতা বলল, ঐ তো অনন্ত উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে।

অনন্ত ওইখান থেকেই চেঁচিয়ে বলল, পেছনের বাগানে-টাগানে দেখে এসেছি আমি। কোথাও নেই।

ইরা কোন কারণে দু-তিনবার ডেকেছিল হেনাকে। সাড়া পায়নি। তারপরই হেনার খোঁজ পড়েছে। সে নেই, সে কোথায় গেছে কেউ জানে না।

প্রমিতার মুখে আশঙ্কার ছায়া পড়ল। গ্রাম্য বোকা মেয়ে, হঠাৎ কারুকে কিছু না বলে চলে গেল ? নিশ্চয় কোন বিপদ হয়েছে।

অনন্ত বলল, রাস্তায় দেখে আসব ?

প্রমিতা স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি একটু দেখবে ? এদিককার রাস্তা দিয়ে খুব জোরে গাড়ি যায়—

এই দুপুরবেলা যুবতী ঝিকে খোঁজার জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘোরার একটুও ইচ্ছে নেই শৈবালের। তাও নিজের বাড়ির নয়, অন্য বাড়ির ঝি।

ঐ অনন্তই দেখে আসুক।

পিক্‌লু বলল আমিও যাই অনন্তদার সঙ্গে ?

বাবলি রিন্টুও অমনি যাবার জন্য পা বাড়িয়ে আসে। দুপুরবেলা ওদের ওপরে আটকে রাখা হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত শুধু অনন্তই গেল।

আর ঘুম কিংবা বই পড়া হল না। একতলায় নেমে এলো তিনজনে। অনন্ত হেনাকে খুঁজে না পেলে থানায় খবর দিতে হবে কি না সে কথা দুই নারীই জিজ্ঞেস করে শৈবালকে। অর্থাৎ সে রকম কিছু হলে শৈবালকেই যেতে হবে থানায়। পুলিশ-টুলিশ সে একেবারেই পছন্দ করে না।

ইরা বলল, এই জন্যই কম বয়েসী কাজের মেয়ে রাখা এক ঝামেলা।

প্রমিতা বলল, মেয়েটা খুব ভাল।

তা ঠিকই। কিন্তু চোখে চোখে রাখতে হয়। তোদের ছেলেটা খুব কাজের, সব

কাজ বুঝে শুনে করে।

অনন্তর তো সবই ভাল, তবে রান্নাটা তেমন পারে না।

আমার সঙ্গে বদলাবদলি করবি ? তুই হেনাকে নে। আমার ভাল রান্নার দরকার নেই।

এর উত্তরে প্রমিতা শুধু হাসল। এত বিশ্বাসী নির্ভরযোগ্য ছেলে অনন্ত। তাকে সে নিজের বাড়িতে কাজ ছাড়িয়ে দেবে কোন যুক্তিতে ? অনন্ত এখন ঘরের ছেলের মতন হয়ে গেছে।

একটু পরেই হেনাকে ধরে নিয়ে এলো অনন্ত। হেনার কাপড়-চোপড় সব ভেজা।

চোখ কপালে তুলে প্রমিতা বলল, কী সর্বনাশ ? জলে পড়ে গিয়েছিল নাকি ?

অনন্ত মুচকি হেসে বলল, না।

তাহলে এরকম ভেজা কেন ?

অনন্ত হাসি মুখটি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে বলল, আমি জানি না। আমি তো গিয়ে দেখলাম ঐ রকম...

এবার প্রমিতা মেয়েটির দিকে এক পা এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, এই, তুই কোথায় গিয়েছিলি ?

হেনা খুবই ভয় পেয়ে গেছে। মুখ নিচু করে তাকিয়ে আছে মাটির দিকে।

কোথায় গিয়েছিলি ? কথা বলছিস না কেন ?

হেনা তবু অপরাধীর মতন মুখ আমসি করে দাঁড়িয়ে আছে।

চুপ করে রইলি কেন ? বল্, কোথায় গিয়েছিল ? এই অচেনা জায়গায়...

চান করতে গিয়েছিলাম।

চান করতে। এই বেলা সাড়ে তিনটের সময় ? একতলায় তেকে তো বাথরুম দেখিয়ে দিয়েছি, তবে আবার কোথায় গিয়েছিলি ?

হোটেলে একজল লোক বলল, এখানে...এই নদী গঙ্গা...গঙ্গার কাছে এসে চান না করলে পাপ হয়। সেই জন্য ভাবলুম একটা ডুব দিয়ে আসি।

প্রমিতাই হেনাকে দিয়েছে ইরার বাড়িতে। সেইজন্য তারই যেন দায়িত্ব এই ভাবে সে জেরা করেছিল। কিন্তু ইরা ওর মাইনে দেয়, সুতরাং সে-ই ওর মালিক। সে এগিয়ে এলো এবার।

শৈবাল একটু দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। এর মধ্যে তার মাথা গলাবার দরকার নেই।

ইরা জিজ্ঞেস করল, তুই গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছিলি, আমাদের কারুকে বলে

যাসনি কেন ?

সেই রকমই নতমুখে থেকে হেনা বলল ভাবলুম আপনারা ঘুমোচ্ছেন—

তা বলে অচেনা জায়গায়....হঠাৎ না বলে কয়ে.....তুই অনন্তকে বলে যাসনি কেন ? ও তো জেগেই ছিল !

হেনা এবার চুপ।

শৈবাল ভাবল, একটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। হেনা আর অনন্ত পরস্পর খুবই কম কথা বলে। খাবার টেবিলেও ওরা গল্প করেছে বলে মনে হয়নি। আমরা ভাবি এক বয়েসী ছেলেমেয়ে কাছাকাছি এলেই ভাব করে নেবে, প্রেম-ট্রেমের চেষ্টা করবে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা কি তা করে না ?

ইরা বলল, যা শিগগির কাপড় বদলে নে। তুই দোতলায় থাকবি, তোর ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি।

অনন্ত থাকবে একতলায়। আর দোতলায় ভাঁড়ার ঘরের মতন একটা ছোট্ট খালি ঘর নির্দিষ্ট হয়েছে হেনার জন্য। এটা ইরা আর প্রমিতা আগেই ঠিক করে নিয়েছে।

সন্ধ্যেবেলা একসঙ্গে জন্মদিন হল বাবলি আর পিক্‌লুর। দুটি কেক আনা হয়েছে, আর সমান মোমবাতি। অন্য অন্য বছর এই দিনে বাবলি আর পিক্‌লুর ক্লাসের বন্ধুরা আসে। এবার তারা কেউ নেই, তবু খুব জমে গেল।

ইরা আর প্রমিতা গান গাইল, হ্যাপি বার্থ-ডে টু য়ু....হ্যাপি বার্থ-ডে টু য়ু....ও ডার্লিং....

শৈবাল গাইল ঃ পিক্‌লু বাবলির জন্মদিনে জানাই ভালবাসা....সুখে থাক, ভাল থাক, এই আমাদের আশা....

তারপরই শৈবাল চলে গেল মাছের আড়তে। ডায়মণ্ডহারবারে এসে টাটকা ইলিশ না খেয়ে থাকার কোন মানেই হয় না।

প্রায় সওয়া দু'কিলো ওজনের একটি সুগঠিত ইলিশ নিয়ে শৈবাল ফিরল ঘন্টাখানেক বাদে। মুখে বেশ একটা গর্বের ভাব। বাইশ টাকা করে কিলো, তা হোক, এক আধদিন একটু বাজে খরচ করা যায়ই।

ইরা ইলিশ মাছ খায় না। ওর অ্যালার্জি হয়।

আফসোস করে ইরা বলল, জানেন, ছেলেবেলায় কী ভালোবাসতুম ইলিশ খেতে ! এখনো দেখলে লোভ হয়। কিন্তু খাবার উপায় নেই....কী যে ছাই অ্যালার্জি, একটু মুখে দিলেই সারা গায়ে র‍্যাশ বেরুবে।

শৈবাল নিরাশ হয়ে গেল। ইলিশ মাছেও কারুর যে অ্যালার্জি থাকতে পারে সে

কোন দিন ধারণাই করেনি।

প্রমিতা বলল, তুমি ফট করে আমাদের না জিজ্ঞেস করে-টরে হঠাৎ একটা এত বড় ইলিশ আনতে গেলে কেন? ভেবেছিলুম আজ মুর্গী হবে।

শৈবাল ভেবেছিল, ওদের না জানিয়ে হঠাৎ এত বড় একটা ভাল ইলিশ এনে চমকে খুশি করে দেবে। তার বদলে এই রকম প্রতিক্রিয়া?

সে ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে সমর্থন পাবার জন্য তাকালো। ইংরেজি ইস্কুলে পড়া আজকালকার বাচ্চা, ওদের মাছ সম্পর্কে কোন আগ্রহই নেই। মাছ খেতেই চায় না। ইংলিশ মিডিয়াম কি মাছকে অবজ্ঞা করতে শেখায়? সব বাচ্চার একই অবস্থা কেন?

শৈবালের বাবা এক একদিন হঠাৎ বাগবাজারের ঘাট থেকে এ রকম ইলিশ কিনে আনতেন সন্ধেবেলা। ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে শৈবাল আনন্দে হৈহৈ করে উঠত তা দেখে। ইলিশের গন্ধে ম ম করত সারা বাড়ি। ভাত খাবার পর আঁচাতে ইচ্ছে করত না, যদি হাত থেকে ইলিশের গন্ধটা চলে যায়! হ্যাঁ, শৈবালদের দেশ পূর্ববঙ্গেই।

তাহলে মুর্গীই হোক?

ইরা বলল, না না, অত বড় মাছটা এনেছেন, আবার মুর্গীর কি দরকার। আমি না হয় খাব না। রাত্রে আমার মাছ মাংস না খেলেও চলে।

প্রমিতা বলল, অতবড় মাছ কে খাবে? নষ্ট হবে? আমি এক টুকরোর বেশী খেতে পারি না। ছেলেমেয়েরাও এক আধ টুকরো খায় কিনা সন্দেহ।

হেনা আর অনন্ত মুগ্ধভাবে চেয়ে আছে মাছটার দিকে। ওরা গ্রামের লোক, ওরা মাছ চেনে। শৈবাল ওদের সঙ্গে বসে খাবে।

ইরা বা প্রমিতা কারুরই রান্নাঘরে ঢোকার ইচ্ছে নেই। বেড়াতে এসে কারই বা এসব ভাল লাগে। আর কাজের লোক আনা হয়েছেই যখন, তখন আর ও নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। অনন্ত আর হেনা গেল রান্নাঘরে।

কিছুক্ষণ নদীর ধারে হেঁটে আসা হল। তারপর বাড়িতে ছাদের ওপরে আড্ডা। এখান থেকেও নদী দেখা যায়। হুহু করে বইছে উড়িয়ে নিয়ে যাবার মতন হাওয়া। ইরা অনেক রকম মজার মজার খেলা জানে, ছেলেমেয়েদের একেবারে জমিয়ে রেখে দিল। কখন যে সময়টা কেটে গেছে খেয়াল নেই, হঠাৎ এক সময় দেখা গেল দশটা বাজে। রিন্টু ঘুমিয়ে পড়েছে এক ফাঁকে। ডেকে তোলা হল তাকে।

নীচে নেমে এসে প্রমিতা বলল, অনন্ত, বাচ্চাদের আগে খাবার দিয়ে দে।

অনন্ত কাচু-মাচু মুখে জানাল, এখনো ভাত হয়নি। সবে চাপানো হয়েছে। শোনা

মাত্র দুই মা তাদের চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠল। এখনো ভাত হয়নি ! ছেলেমেয়েরা খাবে কখন ? রাত দশটা বেজে গেল...। কেন ভাত হয়নি ?

মাছ কোটা হয়েছে, দু'রকম মাছের ঝোল হয়েছে, ডাল হয়েছে, এঁচোড়ের তরকারি, ফুলকপির ডালনা...ভাতটা শেষকালে করবে ভেবেছিল অনন্ত।

প্রমিতা একেবারে অগ্নিমূর্তি ধরল। অনন্তকে আজকাল সে বকুনি দেয় না, তবু আজ বকল, তোর একটু আক্কেল নেই ? ছেলেমেয়েরা খাবে...

ইরা বলল, ভাতটা হয়ে থাকলে তবু শুধু দুটি ডাল-ভাত একটা কিছু ভাজা-টাজা দিয়ে খাইয়ে দিতাম। সন্ধেবেলা তো অনেকখানি কেক খেয়েছেই—

প্রমিতা বলল, কি করছিলি এতক্ষণ, আড্ডা মারছিলি ?

ইরা বলল, এঁচোড়ের তরকারি, আবার ফুলকপির ডালনা—এত রকম হাবিজাবি কে করতে বলেছে ?

অনন্ত বলল, আপনি ইলিশ মাছ খাবেন না, তাই ভাবলুম ফুলকপির ডালনাটা—

ইরা বলল, আমার জন্য ? রাত বারোটার সময় আমি ঐ সব খেতে যাব আর ছেলেমেয়েরা না খেয়ে ঘুমোবে ?

প্রমিতা বলল, দুটো উনুন দু'হাতে কাজ করলে এতক্ষণে সব কিছু হয়ে যাবার কথা—কি করছিলি সত্যি করে বল তো ?

শুধু অনন্তই বকুনি খাচ্ছে দেখে ইরা এবার তার দাসীকে ডেকে বলল, হেনা, তুই জানিস না, পিক্‌লুবাবু সাড়ে ন'টার মধ্যে খায় ? আর সওয়া দশটা বেজে গেছে, এখনো ভাতই হয়নি—

হেনা বললো, আমি তো ভেবেছিলাম....

—চুপ ! তোকে কে ভাবতে বলেছে ? তোর কাজ করার কথা, ভাববার তো কথা নয় !

এরপর হেনা আর অনন্ত প্রবল বৃষ্টিপাতের মত বকুনি খেল কিছুক্ষণ। ওরা অবশ্য কেউই আর উত্তর দিল না।

ছেলেমেয়েরা সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে। এখনকার ছেলেমেয়েদের স্বভাবই তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়া। ওরা ভোরে ওঠে। কেননা স্কুলে যেতে হয় তাড়াতাড়ি। শৈবালদের সময় স্কুল ছিল এগারোটায়, এখন তার ছেলেমেয়েরা সাড়ে আটটার মধ্যে স্কুলে চলে যায়।

যাই হোক, কিছুক্ষণের মধ্যেই খেতে বসিয়ে দেওয়া হল ওদের। ঘুমন্ত ছেলেমেয়েদের খাওয়ানো যে কি কঠিন কাজ ! এক একজন ঢুলে ঢুলে পড়ে, আর

প্রমিতা আর ইরা তাদের ডেকে ডেকে জাগায়। ইলিশ মাছ ওরা প্রায় কেউই খেল না। কেক খেয়ে ওদের পেট ভর্তি, ওদের খাবারই ইচ্ছে নেই।

বড়রা খেতে বসল একটু পরে। তখন শৈবাল বুঝতে পারল, কেন অনন্ত ভাতটা শেষকালে চাপিয়েছিল। গরম গরম ধোঁয়া ওঠা ভাতের স্বাদই আলাদা, তার সঙ্গে টাটকা ইলিশ মাছের ঝোল, এ যে একেবারে অমৃত !

ছেলেমেয়েরা ভাল করে খায়নি বলেই যেন ইরা আর প্রমিতার খাওয়ায় রুচি নেই। সুতরাং শৈবালই বা একগাদা খায় কি করে ? অত সাধ করে সে এনেছে ইলিশটা, তার ইচ্ছে ছিল এই নিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলে। কিন্তু ইরা বা প্রমিতার মাছ বিষয়ে কোনো উৎসাহই নেই। শৈবাল দু' একবার বলতে গিয়েও থেমে গেল। তার মনে হলো, হায়, বাঙালীরা আজকাল ইলিশ মাছের কথাও ভুলে যাচ্ছে ! দু'পীস ইলিশের পেটি খাওয়ার পর আরও একখানা খাওয়ার জন্য তার মন কেমন করছিল, কিন্তু সে হাত গুটিয়ে ফেলল।

সব পর্ব চুকল সাড়ে এগারোটায়। এক্ষুণি শুয়ে পড়ার কোন মানে হয় না, ঈদের চাঁদ উঠেছে আকাশে, ওরা এসে আবার বসল ছাদে। ইরা চমৎকার রবীন্দ্র সঙ্গীত গায়, প্রমিতার ঝোঁক অতুলপ্রসাদ-দ্বিজেন্দ্রগীতিতে। দুই সখী বেছে বেছে চাঁদ বিষয়ক গান শুরু করল, একটার পর একটা। শৈবালের গলায় একদম সুর নেই, তবু সে মুডের মাথায় ওদের এক একটা গানের সঙ্গে গলা মেলাতে গেলে ওরা দুজনেই হেসে ওঠে।

হঠাৎ শৈবালের মনে হল, আর দু-একজন বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে এলে বেশ ভাল লাগত। তারপরই শৈবাল ভাবল, দুটি সুন্দরী মহিলার সঙ্গে আমি একমাত্র পুরুষ, এটাই তো অনেকের কাছে ঈর্ষার ব্যাপার, অথচ আমি এখানে অন্য বন্ধুদের উপস্থিতি চাইছিলাম ? আশ্চর্য তো !

গান থামিয়ে অপ্রাসঙ্গিক ভাবে প্রমিতা বলল, ওদের দুজনকে একসঙ্গে রান্নাঘরে অতক্ষণ থাকতে দেওয়া ঠিক হয়নি।

ইরা বলল, হেনাকে তো আমি ওপরে শুতে বলেছিলাম, আবার নীচে-টিচে চলে যায়নি তো ?

রবীন্দ্রনাথ-অতুলপ্রসাদের গানের মাঝখানে ঝি-চাকরদের আলোচনা চলল একটুক্ষণ। নীচ থেকে রিন্টু ডেকে উঠল, মা, মা বলে !

ঘুম ভেঙে রিন্টু একবার হিসি করতে যায় রোজ এই সময়। একলা ঘরের বাইরে যেতে সে ভয় পায়। বাবলিকে তো শত ডাকলেও সে উঠবে না।

প্রমিতা নীচে চলে গেল। ছাদে শুধু ইরা আর শৈবাল। ইরা আবার গান গেয়ে যেতে লাগল আপন মনে। দুটি গান শেষ করার পর সে জিজ্ঞেস করল, আপনি এত ঝিম মেরে গেলেন কেন ? কথা-টথা বলছেন না যে ? ঘুম পেয়ে গেছে বুঝি ?

চমকে উঠে শৈবাল বলল, না শুনছিলাম। এত ভাল গাইছেন—

চোখ বুজে আসছিল আপনার ?

না না, ও এমনিই।

আমারও ঘুম পেয়ে গেছে, চলুন, উঠে পড়ি।

স্ত্রীর সুন্দরী বান্ধবীর সঙ্গে নিরালায়, জ্যোৎস্না মাখা আকাশের নীচে কোথায় দু-একটা মধুর কথা বলবে শৈবাল, তা নয়, সে চোখ বুজে ছিল !

সে শুধু বলল, আর একটু বসুন না।

ততক্ষণে ইরা উঠে দাঁড়িয়েছে। সে বলল, না, এবার নীচে যাওয়া যাক।

এরপর নিজের ঘরটায় এসে শুয়ে পড়ে শৈবাল একটা ছোট্ট স্বপ্ন দেখল। ঠিক স্বপ্ন নয়, চোখ বুজে দেখা একটি চলন্ত ছবি।

কোথায় যেন জায়গাটা ? কৃষ্ণনগরের কাছে, পারমাদান না ? যাওয়া হয়েছিল জীপ গাড়িতে, সব মিলিয়ে ন'জন, দারুণ ঠাসাঠাসি....সকালবেলা বেরিয়ে ঘন্টাচারেকের মধ্যে পৌঁছে যাবার কথা, কিন্তু রানাঘাট না কোথায় যেন খারাপ হয়ে গেল জীপ গাড়িটা, তার ওপরে আবার তুমুল বৃষ্টি। পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধে হয়ে গেল। একটা ছোট্ট ডাকবাংলো। চৌকিদার বলল, এত লোকের রান্নার ব্যবস্থা নেই তার ওখানে, কিন্তু তা শুনে কেউ ভ্রূক্ষেপও করল না, খাওয়া-দাওয়ার যেন কোন চিন্তাই নেই, ও যা কিছু একটা হয়ে যাবে....। কেমিস্ট্রিতে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া ছাত্র দেবকুমারের যে অত গুণ, তা কে জানত ? মাঠের মধ্যে ইট দিয়ে একটা উনুন বানিয়ে ফেলল চটপট। রাত্তিরে ঐখানে মুনলাইট পিকনিক হবে। শৈবালকে পাঠানো হল জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠকুটো কুড়িয়ে আনতে। চৌকিদার কি যেন আপত্তি তুলেছিল, তাকে বলা হল, চোপ !

রাত ন'টার পর বেরিয়ে গিয়ে কাছাকাছি গ্রাম থেকে মুরগী যোগাড় করে আনল দেবকুমার। ঠিক হল ছেলেরাই রাঁধবে, মেয়েরা দেখবে। ইরার সঙ্গে তখনো বিয়ে হয়নি দেবকুমারের, প্রমিতাকে সদ্য বিয়ে করেছে শৈবাল। আরও যেন কারা ছিল। সুমন্ত্র, জয়া, মঞ্জু, অনীশ আর সুকুমার।

কাঠের আঁচ, বারবার নিভে যায়। শৈবালের ওপর ভার উনুনে কাঠ যোগানো শুধু। কারণ সে রান্নার কিছু জানে না। উনুনে ফুঁ দিতে দিতে তার চোখ লাল।

রাত একটা বেজে গেল, তখনও শুধু ভাত হয়েছে, মাংস চাপেনি। তখন ইরা আর প্রমিতা কোমরে শাড়ি জড়িয়ে এসে বলল, ঢের হয়েছে। এবার আপনারা উঠুন তো মশায়রা, এবার আমরা দেখছি।

খেতে বসা হল রাত আড়াইটেয়। প্রমিতা ঠাট্টা করে বলেছিল, আর একটু অপেক্ষা করলে এটাই আমাদের সকালের ব্রেকফাস্ট হয়ে যেত !

ভাতের তলায় পোড়া লেগে গিয়েছিল, ধোঁয়া ধোঁয়া গন্ধ, তবু সেই ভাতই সব শেষ হয়ে গেল। চেটে পুটে খাবার পর দেবকুমার বলেছিল, ইস্, আর নেই ? মাংসটা দারুণ রান্না হয়েছিল সত্যি।

কতদিন আগের কথা ? তের না চোদ্দ বছর ? সেই প্রমিতা আর ইরা কত বদলে গেছে। আজও চাঁদের আলো আছে, অথচ আজকের পিকনিক....

পাশ ফিরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল শৈবাল। সে নিজেও কি বদলে গেছে কম ? সে এখন যে কোন ব্যাপারে কিছু খরচ করতে গেলেই টাকার হিসেব করে। গান গাইতে গাইতে ইরা মনে করে, শৈবাল গান শুনছে না, ঘুমিয়ে পড়েছে। সত্যিই তো তখন একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল শৈবালের !

ঘুমের মধ্যেই শৈবাল একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পাশ ফিরলো।

পরদিন বাড়ি ফেরার পথে ইরা বললো, যাই হোক, বেশ কাটলো এখানে। বেশ জমেছিল। মাঝে মাঝে এরকম বেরিয়ে পড়তে পারলে....।

গত রাতের স্বপ্নটা মনে পড়ায় মুচকি হাসলো শৈবাল। জমেছিলই বটে। তবে বাচ্চারা বেশ আনন্দ করেছে, ওদের তো সব কিছুতেই আনন্দ।

॥ চার ॥

কলকাতায় ফেরার দুদিন পরেই আবার গণ্ডগোল। অনন্তর জ্বর খুব বেড়েছে। সারা গায়ে ব্যথা। সকালবেলা অনন্ত বিছানা ছেড়ে ওঠেই নি, ঝিম্ মেরে শুয়ে থাকে। এরকম সে কক্ষনো করে না। বেশ সীরিয়াস ব্যাপার। ডাক্তার ডাকতে হবে। শৈবাল নিজেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কারুর অসুখ দেখলেই এ রকম ব্যস্ত হয়ে ওঠা শৈবালের স্বভাব। সে নিজের ছেলেমেয়েরই হোক বা কাজের লোকেরই হোক।

পাড়ার একজন ডাক্তার শৈবালের বিশেষ চেনা, প্রায় বন্ধুর মতন। সুতরাং কোন অসুবিধে নেই। সেই ডাক্তারটি ওদের বাড়িতে এসে দেখলেও চেম্বারের সমানই ভিজিট

নেন। সুতরাং অনন্তকে আর চেম্বারে নিয়ে যেতে হবে না। চা খেয়েই শৈবাল বেরিয়ে ডাক্তারকে খবর দিয়ে এলো। তিনি বললেন বাড়ি ফেরার পথে এসে দেখে যাবেন।

শৈবাল ফিরে এসে দেখল, সিঁড়ি দিয়ে তার একটু আগে আগেই উঠছে প্রমিতার বান্ধবী ইরা। সঙ্গে সেই মেয়েটি, হেনা। শৈবাল মুচকি হাসল, তার কথা ঠিক মিলে গেছে। ইরা এরই মধ্যে ফেরত দিতে এসেছে মেয়েটিকে। ইরাদের বাড়িতে কিছুতেই লোক টেকে না।

ঠিক মেলেনি অবশ্য। ইরা ফেরত দিতে আসেনি হেনাকে। ওকে সঙ্গে নিয়ে বাজার করতে বেরিয়েছে। তার আগে এ বাড়িতে ঘুরে যাওয়ার একটা উদ্দেশ্য আছে। হেনা তার গামছা ফেলে গিয়েছিল এ বাড়িতে। সেটা নিতে এসেছে। হেনার সঙ্গে একটা ছোট্ট জামা-কাপড়ের পুঁটুলি ছিল। সেটা সে নিয়ে গেছে বটে, কিন্তু ভুল করে গামছাটা রেখে গেছে।

বসবার ঘরে প্রমিতা, ইরা আর শৈবাল বসল। প্রমিতা হেনাকে বলল, বারান্দায় অনন্তর জামাকাপড় থাকে, দ্যাখ সেখানে তোর গামছাটা আছে।

হেনা এসে দেখল সেখানে মাদুর পেতে শুয়ে আছে অনন্ত। চোখ দুটো লাল। এদিক ওদিক তাকিয়ে হেনা তার গামছাটা খুঁজে পেল না। অনন্তকে জিজ্ঞেস করতেও লজ্জা হচ্ছে। অনন্ত নিজেই জিজ্ঞেস করল, কি ?

আমার গামছাটা।

অনন্ত আঙুল দিয়ে দেখাল, ঐ যে।

এক কোণে একটা খবরের কাগজে মোড়া প্যাকেট। অনন্ত যত্ন করে গামছাটা রেখে দিয়েছে। হেনা ভেবেছিল গামছাটা সে বোধ হয় আর পাবে না। অনন্ত সেটা ফেলে দেবে, কিংবা ঘর মোছা করবে।

প্যাকেটটা হাতে তুলে নিয়ে হেনা একটু দাঁড়াল।

অনন্ত বলল, আমায় এক গেলাস জল এনে দেবে ? ভীষণ গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।

কথাটা শুনে দুঃখের বদলে খুব লজ্জা হল হেনার। সে এ বাড়িতে কাজ করে না। রান্নাঘর থেকে জল গড়িয়ে বাবু আর দিদিমণিদের সামনে দিয়ে তাকে নিয়ে অসতে হবে। যদি কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেন ? যদি কেউ কিছু ভাবেন ? অথচ কেউ জল চাইলে জল না দিয়েও পারা যায় না। হেনাকে দেখেছে বলেই তো অনন্ত জল চেয়েছে। সে তো বাবু কিংবা দিদিমণিকে ডেকে জল চাইতে পারে না। চাকর-বাকররা অসুখ হলেও কি বাবুদের কাছে সেবা চায় ?

সে রান্নাঘরে গেল জল গড়িয়ে আনতে। একটা-গেলাস ভরে নিয়ে বেরিয়ে

আসছে, অমনি প্রমিতা ঠিক দেখে ফেলেছে তাকে।

ও কি করছিস ?

ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল হেনা। দিদিমণির গলায় ঝাঁঝ। সে কি কিছু অন্যায় করে ফেলেছে ? কাঁপা কাঁপা গলায় সে বলল, ঐ যে ও, ও জল চাইছিল।

ও মানে কে ?

ঐ যে....অনন্ত !

প্রমিতা বলল, জল চাইছে অনন্ত ? তুই এই গেলাসে....একবার আমাদের জিজ্ঞেস করতেও পারিস না ? অনন্তর তো আলাদা গেলাস আছে, সেটাতে দিবি তো। এটা তো বাবুর গেলাস। রান্নাঘরে দ্যাখ একটা কলাই করা গেলাস আছে।

ইরা ধমক দিয়ে বলল, তুই আগে আমাদের বলবি তো। আগেই নিজে সর্দারি করে গেলাস নিতে গেছিস কেন ?

সেই কথাটাই তো ভাবছিল হেনা। চাকর-বাকররা জল চাইলে সে কথা কি বাবুদের বলা যায় ? তার সামান্য বুদ্ধিতে এর উত্তরটা খুঁজে পায় নি।

কলাই করা গেলাসটা খুঁজে পেয়ে তাতে করে জল এনে দিল হেনা। কোন রকমে মাথা উঁচু করে জলটা খেল অনন্ত। একদিনের জ্বরেই সে বেশ কাবু হয়ে গেছে। এক চুমুকে জলটা শেষ করে সে বলল, ওঃ !

হেনার ইচ্ছে হল অনন্তকে একটা কিছু বলে। কোন সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু কোন কথাই তার মনে এলো না।

এই সময় ইরা ডাকল, হেনা, হেনা ! গামছা পেয়েছিস ?

হেনার কিছুই বলা হল না।

ইরারা চলে যাবার পর শৈবাল বলল, বাবাঃ, কি কঞ্জুস তোমার বান্ধবী ! একটা গামছাও কিনে দিতে পারে না ? সেজন্য এত দূর এসেছে !

এ ব্যাপারটা প্রমিতারও দৃষ্টিকটু লেগেছে। তাই সে বান্ধবীর সমর্থনে কোন কথা বলতে পারল না। একটা পুরনো গামছার জন্য এত দূর আসা মোটেই মানায় না ইরাকে। অথচ ইরা মোটেই কৃপণ নয়। যখন তখন টাকা পয়সা হারায়। বন্ধু-বান্ধবদের দামী দামী জিনিস উপহার দেয়।

শৈবালই আবার বলল, অবশ্য সপ্তাহে দু-তিনবার ঝি-চাকর বদলালে কতজনকেই বা গামছা কিনে দেবে ! ইরা বোধ হয় যাচাই করে দেখতে এসেছিল, ঐ মেয়েটা সত্যিই গামছা ফেলে গেছে না মিথ্যা কথা বলেছে।

প্রমিতা বলল, তোমার সঙ্গে আমার গল্প করলে চলবে না। রান্না করতে হবে।

আজ শুধু ফেনা ভাত খেয়ে যেতে পারবে তো ?

অনন্তর জ্বর ক'দিনে ছাড়বে তার ঠিক নেই। সে ক'দিন প্রমিতাকেই রান্না করতে হবে। সেজন্য প্রমিতা অবশ্য খুব একটা বিরক্ত নয়। অনন্ত প্রায় বাড়ির ছেলের মতন হয়ে গেছে। অনেক লোকজন ছাড়বার পর ওকে এখন খুব পছন্দ হয়েছে শৈবালেরও। এ রকম শান্ত, নিরীহ লোক আর পাওয়া যাবে না।

ইচ্ছে করলে প্রমিতা বেশ দ্রুত হাতেই রান্নার কাজ সেরে ফেলতে পারে। ইস্কুল-অফিসের ঠিক সময়ে সে খাবার দিয়ে দিল।

শৈবাল বললো, এখন ক'দিন তোমায় রান্না করতে হয় দ্যাখো !

প্রমিতা বললো, সে আমি ঠিক চালিয়ে দেবো।

যাবার সময় শৈবাল বললো, ডাক্তার এলে জিজ্ঞেস করে নিও, অনন্ত কি খাবে ?

প্রমিতা বললো, দুধ পাঁউরুটি দিয়ে দেবো না হয় !

অফিসে কাজের মধ্যে সবে মাত্র ডুব দিয়েছে শৈবাল, এই সময় বাড়ি থেকে ফোন এলো। প্রমিতা ভয়ে প্রায় চিৎকার করছে। তক্ষুণি সে শৈবালকে একবার বাড়ি চলে আসবার জন্য অনুরোধ করছে।

আবার গোলমাল। দারুণ গোলপাল। ডাক্তারবাবু এসে বলে গেছেন, অনন্তর পক্স হয়েছে !

॥ পাঁচ ॥

অনন্তর দেশ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কোন্ এক গ্রামে। বছরে সে দু'বার মাত্র ছুটি নিয়ে বাড়ি যায়। এবং খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, সে দশ দিনের ছুটি নিয়ে গেলে ঠিক দশ দিন বাদেই ফিরে আসে। এমন আর দেখা যায় না। প্রমিতার চেনা শোনা আত্মীয়-স্বজনের সব বাড়ির কাজের লোক একবার ছুটি নিলে আর সহজে ফেরে না। অনেকে ছুটির নাম করে পালিয়ে যায়। ছোটমাসীর বাড়ির কাজের লোক অর্থাৎ চাকরটি দেশে তার মায়ের অসুখ বলে ছুটি নিয়ে গেল। দু'দিন বাদেই দেখা গেল সে লেকে কুকুর নিয়ে বেড়াচ্ছে। ছোটমাসীর ছেলেকে দেখে সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। সে কেয়াতলায় অন্য এক বাড়িতে কাজ করছে।

প্রমিতার দিদির বাড়ির কাজের লোকটি কাজ ছেড়ে চলে গিয়েছিল, কারণ ও বাড়িতে টেলিভিশান নেই। প্রমিতার জামাইবাবু টেলিভিশান কিনতে পারেন ঠিকই,

কিন্তু ছেলেমেয়েদের পড়াশুনো নষ্ট হবে বলে কিনছেন না। প্রমিতার দিদি এখন রোজই বলেন, টেলিভিশান না কিনলে আর বাড়িতে ঝি-চাকর টিকবে না।

সেদিক থেকে অনন্ত সত্যিই ব্যতিক্রম। শৈবালের টি-ভি. নেই, অনন্ত তবু তো কাজ ছেড়ে চলে যায়নি !

প্রমিতা ফিসফিস করে শৈবালকে বলল, তুমি ওকে ওর দেশে পৌঁছে দিয়ে এসো।

শৈবাল আকাশ থেকে পড়ল। অনন্তকে দেশে পৌঁছে দিয়ে আসব ! কেন ?

প্রমিতা বলল, বাড়িতে দুটো ছেলেমেয়ে রয়েছে, আর এখানে একটা পক্সের রুগী রাখা যায় নাকি ? করপোরেশনের লোক খবর পেলে তো ওকে এমনিতেই ধরে নিয়ে যাবে। তুমি বরং ওকে দেশে দিয়ে এসো।

প্রমিতা বেশ উচ্চশিক্ষিতা, কিন্তু পৃথিবীর অনেক কিছুরই খবর রাখে না। কলকাতায় করপোরেশন বলে কিছু আর নেই, আছে বিনা নির্বাচনের এক জিনিস, তার নাম পুরসভা, তারা পক্সের রুগী তো দূরের কথা, রাস্তার পাগলা কুকুরও ধরে না।

শৈবাল বলল, বিশ্বাসী লোকটাকে তুমি গ্রামে পাঠাবে, ওখানে ওর চিকিৎসা হবে কি করে ?

তা বলে এমন একটা রুগী, বাড়িশুদ্ধ সবাই মরবে ?

শৈবাল ধীর স্বরে বলল, ওর হয়েছে চিকেন পক্স। তাতে মানুষ মরে না।

তুমি কি করে জানলে ?

স্মল পক্স পৃথিবী থেকে উঠে গেছে।

তুমি ছাই জানো !

ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে নাও।

চিকেন পক্সই বা কম কিসে ? জ্বর হবে, ভোগাবে, দুর্বল করে দেবে....তুমি তো ছেলেমেয়ের কথা একদম ভাবো না—

শোন, চিকেন পক্স তো শুধু অনন্তর একলার হয়নি। ও একটা হাওয়া আসে। একবার হতে শুরু করলে অনেকেরই হয়, ওর থেকে পালিয়ে বাঁচা যায় না।

মোট কথা আমি বাড়িতে পক্সের রুগী রাখব না।

আমার পক্স হলে তুমি আমাকেও বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে ?

প্রমিতা এবার অসম্ভব রেগে উঠে বলল, বাজে কথা বলবে না বলছি ! ও রকম বড় বড় কথা সবাই বলতে পারে। সংসারটা আমায় সামলাতে হয়, ছেলেমেয়ের অসুখ হলে কে দেখবে ? সামনেই রিন্টুর পরীক্ষা—

শৈবাল চুপ করে গেল। এ সব ক্ষেত্রে নীরবতাই স্বর্ণময়।

তুমি কাল সকালেই ওকে পৌঁছে দিয়ে এসো।

এবার শৈবালের রেগে ওঠার পালা।

তুমি বলতে চাও আমি ওকে সঙ্গে করে ট্রেনে সেই পাথরপ্রতিমা না কোথায় যাব ? শুনেছি, ট্রেনের পর লঞ্চ, তার থেকে নেমেও আবার মাইল তিনেক হাঁটতে হয়। সেই রাস্তাটা কি আমি ওকে কোলে করে নিয়ে যাব ?

তুমি না গেলে কে যাবে বল ?

আমার অফিস-টফিস নেই, কাজকর্ম নেই, আমি চাকরকে বাড়ি পৌঁছাতে যাব !

একদিন অফিসের ছুটি নিতে পারো না ?

শোন প্রমিতা, একটা সাধারণ কথা বোঝার মতন বুদ্ধি তোমার নেই কেন ? আমি যদি ওকে বাড়ি পৌঁছাতে যাই, ট্রেনে লঞ্চে ওর কাছাকাছি থাকি, তাহলে ওর ছোঁয়াচ লেগে তো আমারও পক্স হতে পারে।

তাহলে অন্য কারুকে দিয়ে পাঠানো যায় না ?

কাকে দিয়ে পাঠাব বল ?

অন্য কোন ফ্ল্যাটের কাজের লোক, যারা ওর বন্ধু-টন্ধু, তাদের কারুকে যদি ডেকে একটু বল, কিছু টাকা দেওয়া হবে তাকে।

আমি এখন অন্য বাড়ির চাকরদের ডেকে ডেকে অনুরোধ করতে যাই আর কি ! ও সব আমার দ্বারা হবে না।

প্রমিতা উঠে গিয়ে বাথরুমে ঢুকে এমন জোরে দরজাটা বন্ধ করল যে সেটা ভেঙে পড়বার উপক্রম।

শৈবাল অনন্তকে দেখার জন্য বারান্দার কাছে গিয়ে উঁকি মারল। ছেলেটা একটা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। শৈবাল দু-একবার ডাকল নাম ধরে। অনন্ত শুধু উঁ উঁ শব্দ করল। মনে হয়, ছেলেটার খুব জ্বর।

চিকেন পক্স একবার বাড়িতে ঢুকলে সকলকে না শুইয়ে ছাড়বে না। তবে অনন্তরই যে কেন আগে হতে গেল ! আগে যদি এ বাড়ির অন্য কারুর হত, তাহলে আর কোন সমস্যা থাকত না।

দু-একটা টুকিটাকি কাজ সারবার জন্য শৈবালকে বেরুতে হল একটু। ফিরে এসে দেখল, এর মধ্যেই প্রমিতা অনেকখানি ব্যবস্থা বদল করে ফেলেছে।

অনন্ত ফ্ল্যাটে কোথাও নেই। তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে একতলার সিঁড়ির নিচে। জায়গাটা খুবই ছোট, একজন মানুষ কোনক্রমে গুটিসুটি মেরে শুতে পারে।

সন্ধেবেলা হয়তো অনেকে নজর করবে না। সকালবেলা ওখানে একজন পক্সের রুগীকে দেখলে বাড়ির অন্যান্য লোক নিশ্চয়ই চ্যাঁচামেচি শুরু করে দেবে।

প্রমিতার এমনিতে বেশ দয়া-মায়া আছে। অনন্তর প্রতি তার স্নেহেরও অভাব ছিল না। তবু সে অনন্তকে ও রকম একটা ঘুপসি অন্ধকার অস্বাস্থ্যকর জায়গায় পাঠাল ?

ছেলেমেয়ের চিন্তায় প্রমিতা আর সব কিছু ভুলে যায়। ছেলেমেয়ে একদিকে, আর সারা পৃথিবী অন্যদিকে।

এই পরিবারের মধ্যে শুধু প্রমিতারই একবার চিকেন পক্স হয়ে গেছে ছেলেবেলায়। সুতরাং আর তার ভয় নেই বোধ হয়। চিকেন পক্স সকলের একবার করে হলেই চুকে যায় ঝঞ্ঝাট। এ দেশে সকলেরই একবার না একবার তো হবেই।

শৈবাল ভাবল, তার নিজের এখন চিকেন পক্স হয়ে গেলে বেশ হয়। তা হলে আর অনন্তকে সরিয়ে দেবার প্রশ্ন উঠবে না। সে নিজেও কিছু দিন অফিসের কাজ থেকে বিশ্রাম পাবে। এমনিতে তো ব্যাটারা কিছুতেই ছুটি দেবে না।

প্রমিতা টেলিফোন করায় ব্যস্ত। যে রকম লম্বা সময় টেলিফোন চলেছে, তাতে এক দিকের কথা শুনেই শৈবাল বুঝল যে বাক্যালাপ চলছে ইরার সঙ্গে।

রিন্টু আর বাবলি খুব মন দিয়ে পড়াশুনা করছে দেখে শৈবাল একটা ইংরেজি গোয়েন্দা নভেল খুলে বসল। কিন্তু তার শান্তি বিঘ্নিত হল অচিরেই।

টেলিফোন ছেড়ে এসে প্রমিতা বলল, তুমিই তো এর জন্য দায়ী—

শৈবাল চোখ বিস্ফারিত করে তাকাল। তার মাথা থেকে তখনো গোয়েন্দা গল্পের ঘোর কাটেনি।—কী ব্যাপার ?

তুমিই তো মেয়েটাকে রাখতে দিলে না !

কোন্ মেয়েটাকে ?

মেয়েটা থাকলে এখন কত উপকারে লাগত। এখন এক হাতে আমি কত দিক সামলাই ? তুমি বলতে লাগলে, মেয়েটাকে তাড়াও, তাড়াও।

আমি মেয়েটাকে তাড়ালাম ? ঐ হেনা না কি যেন মেয়েটা ? তুমি তো এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ খুলে বাড়ি বাড়ি মেয়েটাকে পাঠাতে লাগলে—

মোটেই না, আমি বলেছিলাম, আর দু-একদিন থাক। ইরাকে ফোনে সব জানালাম, ভাবলাম, ইরা যদি মেয়েটাকে ফেরত দেয়।

ইরা তো মেয়েটিকে পছন্দ করেনি। কাজকর্ম ভালো পারে না বলছিল, তা ওর কাছ থেকে ফেরত নিয়ে এসো না।

ইরা ফেরত দিলে তো। আমার অসুবিধের কথা বুঝলই না। এখন একেবারে মেয়েটার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

তা হলে একটা নারী হরণ করা যাক। ইরার বাড়ি থেকে ঐ হেনাকে আমি জোর করে ধরে আনি?

কি বললে?

বলছি যে ও বাড়ি থেকে ঐ হেনাকে আমি ফুস্‌লে কিংবা জোর করে নিয়ে আসবো?

তুমি সব তাতেই ইয়ার্কি করবে?

শৈবাল বুঝল যে ব্যাপার বেশ গুরুতর। আর হাল্‌কা সুরে কথা বলতে গেলে প্রমিতার মেজাজ এমনই গরম হয়ে যাবে যে তখন ধাক্কা সামলাতে হবে শৈবালকেই। সে এবার খানিকটা সহানুভূতির সুরেই বলল, এত লোককে কাজের লোক সাপ্লাই কর, এখন তোমার এই বিপদের সময় কেউ সাহায্য করবে না?

প্রমিতা ছোট্ট করে বলল, দ্যাখ না!

তোমার মাকে খবর দাও না। তিনি যদি কোন লোক পাঠাতে পারেন।

প্রমিতা আবার কণ্ঠস্বর উগ্র করল। চোখ বড় বড় করে বলল, তোমার যেমন বুদ্ধি! মা যদি শোনেন যে অনন্তর পক্স হয়েছে, আর তবুও তাকে আমি এ বাড়িতে রেখেছি, তাহলে আমায় এমন বকুনি দেবেন। তোমার মতন তো সবাই না, আর সবাই বাড়ির লোকের ভালো-মন্দ বিষয়ে চিন্তা করে।

শৈবাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল, সবাই যদি শুধু নিজের বাড়ির লোকের ভালো-মন্দ বিষয়েই চিন্তা করবে, তা হলে অনন্তর মতন যারা বাড়ি ছেড়ে দূরে কাজ করতে এসেছে, তাদের জন্য চিন্তা করবে কে?

প্রমিতা বলল, আজ রাত্রিরে বাইরে খাবো। অনেক দিন তো আমাদের কোথাও নিয়ে যাওনি। রিন্টুটা এত চীনে খাবার ভালোবাসে! প্রায়ই বলে মা, সুইট অ্যান্ড সাওয়ার ডিশ খাব।

তার মানেই একগাদা টাকা গচ্চা। প্রতিমার রান্না করার ইচ্ছে উধাও হয়ে গেছে। সেই জন্য হোটেলে খেতে হবে। অথচ না বলাও চলবে না। তাহলেই প্রমিতা তাকে কৃপণ বলে গঞ্জনা দেবে। অন্যের উদাহরণ দিয়ে খোঁচা মারবে। হাতের কাছেই তো জামাইবাবু অর্থাৎ মণিদা রয়েছেন। প্রমিতা বলবে, মণিদা প্রায়ই দিদি আর বাচ্চাদের বাইরে খাওয়াতে নিয়ে যান, তুমি নিজে থেকে এক দিনও.....

শৈবালও যে মাঝে মাঝে প্রমিতাদের নিয়ে চীনে দোকানে খেতে গেছে, সে কথা

এখন প্রমিতার মনেই পড়বে না।

অনেক মেয়ে টাকার ব্যাপারটা কিছু বোঝে না। কোথা থেকে টাকা আসে, সৎ ভাবে উপার্জন করতে গেলে যে কত মাথার ঘাম পায়ে ঝরাতে হয়, সে সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। যখন যেটা দরকার, সেটা পেতেই হবে। এই সব মেয়েরা বেশীদিন সুন্দরী থাকে। তাদের কপালে ভাঁজ পড়ে না। স্ত্রীকে বেশীদিন সুন্দরী রাখার জন্য শৈবালকে আরও কষ্ট করে টাকা রোজগার করতে হবে।

মুখে একটা কৃত্রিম খুশির ভাব ফুটিয়ে সে বলল, গুড আইডিয়া। তাহলে আর বেশী রাত করে লাভ নেই, তোমরা তৈরি হয়ে নাও।

কোথাও বেরুতে গেলেই প্রমিতা আগে একবার বাথরুমে ঢুকে গা ধুয়ে নেয়। প্রতিমার স্নান করতে লাগে পাক্কা এক ঘন্টা দশ মিনিট, আর সন্ধের পর গা ধুতে পঁয়তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট। অনেকক্ষণ ধরে বাথরুমের মধ্যে কোন জলের আওয়াজ থাকে না, নিথর, নিস্তব্ধ, সেই সময়ে মেয়েরা বাথরুমে কী করে তা জানবার জন্য শৈবালের দারুণ কৌতূহল। এক এক সময় সে ভাবে, বাথরুমের দরজায় একটা ছোট্ট ফুটো করে সে ভেতরটা দেখবে সেই রকম সময়।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে প্রমিতা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধন সেরে নিচ্ছে। চীনে দোকানে খেতে গেলে সাজগোজ করে যাওয়াই নিয়ম। বাথরুম থেকে বেরুবার ঠিক পরের সময়টায় প্রমিতাকে খুব ঝকঝকে তকতকে দেখায়।

ঠিক এই সময় প্রতিবারেই শৈবালের খুব ইচ্ছে করে প্রমিতাকে নিবিড়ভাবে আদর করতে। এমন কি শুয়ে পড়তে। কিন্তু উপায় নেই। জড়িয়ে ধরতে গেলেই প্রমিতা আপত্তি জানায়। তার সাজ নষ্ট হয়ে যাবে। বিবাহিতা মেয়েদের সাজসজ্জা মোটেই তাদের স্বামীদের জন্য নয়। অন্যদের জন্য। অন্যরা দেখবে। তবু বেচারী স্বামীদের দামী শাড়ি দিতে হয়। এবং স্নো-পাউডার পারফিউম ইত্যাদি।

খুব আল্‌তোভাবে প্রমিতার ঘাড়ে একটা চুমু খেয়ে শৈবাল বলল, তোমায় একটা বুদ্ধি দেব ?

কী ?

তোমার বান্ধবী ইরাকে ফোন করে একটা গল্প বল। ওকে বল যে তোমার একটা সোনার দুল চুরি গ্যাছে। এবং তোমার দৃঢ় বিশ্বাস ঐ হেনা নামে মেয়েটাই নিয়েছে।

তার মানে ? হঠাৎ এ কথা বলব কেন ?

ইরা তো ভীষণ ভুলো-মনা। ওর সব সময়ই কিছু না কিছু জিনিস হারায়। তোমার কথা শুনলেই ওর কোন হারানো জিনিসের কথা মনে পড়ে যাবে। আর ভাববে,

হেনাই সেটা চুরি করেছে। ইরা যখন তখন রেগেও যায়। একবার ঐ মেয়েটাকে সন্দেহ করলে অমনি মেয়েটার ওপর খুব রেগে যাবে, আর পত্রপাঠ তাকে বিদায় করবে। আর আমরা অমনি মেয়েটাকে লুফে নেব।

প্রমিতা এবার মুখ ফিরিয়ে হেসে ফেলে বলল, তোমার যত সব উদ্ভট কথা ? তুমি ইরার চরিত্রটা ভালো স্টাডি করেছ তো!

ভালো বুদ্ধি দিয়েছি কিনা, বল ?

ধ্যাৎ! আমি মোটেই ও রকম মিথ্যে কথা বলতে পারব না।

তাহলে আমি বলি ?

না। শুধু শুধু একজনের নামে দোষ চাপাবে ? তোমার লজ্জা করে না ? আমি এ সব একদম পছন্দ করি না।

একজনের নামে চুরির অপবাদ দেওয়া যদি দোষের হয়, তাহলে একজন বিশ্বস্ত কাজের লোককে সামান্য চিকেন পক্স হবার অপরাধে তাড়িয়ে দেওয়া দোষের নয় কেন, তা বোঝা শৈবালের অসাধ্য।

চীনে-দোকানে খাওয়ার পর্ব বেশ ভালো ভাবেই চুকল। শুধু শেষের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল রিণ্টু। তাকে কোলে নিতে হল শৈবালকে। রিণ্টু এখন বেশ বড় হয়েছে, তাকে বেশীক্ষণ কোলে নিলে শৈবাল হাঁপিয়ে পড়ে।

রেস্টুরেণ্ট থেকে বেরিয়ে সহজে ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। রিণ্টুকে কাঁধে নিয়ে সেই অবস্থায় শৈবালকে ট্যাক্সির পিছনে দৌড়াদৌড়ি করতে হল অনেকক্ষণ। চৌরঙ্গী পাড়ায় এমন ন্যাবড়া-জ্যাবড়া ভাবে ঘোরা একটা বিশ্রী ব্যাপার, অফিসের কেউ হঠাৎ দেখে ফেললে কি ভাববে ?

মোটের ওপর শৈবাল মনে মনে বেশ খানিকটা বিরক্ত হলেও মুখে তা প্রকাশ করল না। ঠোঁটে তার হাসি আঁকা রইল।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, আগামী কালও যদি কোন রান্নার লোক না পাওয়া যায় আর প্রমিতা রান্নার ব্যাপার নিয়ে গজগজ করে, তাহলে সে নিজেই রাঁধতে শুরু করবে। শৈবাল এক সময়ে বয়-স্কাউট ক্যাম্পে এমন মুসুরির ডাল রেঁধেছিল যে সবাই ধন্য ধন্য করেছিল এবং মেরিট ব্যাজ দেওয়া হয়েছিল তাকে।

না হয় মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দাখিল করে অফিস থেকে ছুটিই নেবে সাতদিন। তা বলে রোজ রোজ তো বাইরের হোটেলে সপরিবারে খেয়ে সে সর্বস্বান্ত হতে পারে না!

প্রমিতা যে রান্না জানে না তাও নয়। ভালোই জানে। যে কোন একটা আইটেম

রান্নায় তার হাত খুব চমৎকার। চিকেন স্টু, দই-পোনামাছ কিংবা নারকেলবাটা-চিংড়ি তার হাতে অপূর্ব। কিন্তু ভাত, ডাল, ছেঁচকি, তরকারি, মাছের ঝোল—এই সব রান্না তার কাছে অসহ্য। যদি বাধ্য হয়ে রাঁধতেই হয়, তাহলে তার এমন মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে যে তার ঠ্যালা সামলাতে শৈবালকে অন্তত আড়াইশো টাকা দামের শাড়ি কিনে দিতে হবে। রোজ রোজ তো আর কেউ চিকেন স্টু কিংবা দই-পোনামাছ খেয়ে কাটাতে পারে না।

মাঝরাতে ঘুমন্ত শৈবালকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তুলে প্রমিতা উৎকণ্ঠিতভাবে বলল, এই, এই শোন—

শৈবাল ধড়মড় করে উঠে বসে বলল, কি ? কি হয়েছে ?

একবার পাশের ঘরে এসো তো।

কেন ?

এসো না !

আরে কেন বলবে তো ? কি মুশকিল !

দ্যাখ তো রিণ্টুর জ্বর হয়েছে কিনা। মনে হচ্ছে যেন গা-টা ছ্যাঁকছ্যাঁক করছে।

এবার ভালো করে ঘুম ভাঙল শৈবালের। খাট থেকে নেমে পড়ে বলল, কই, চল তো দেখি।

পাশের ঘরে পাশাপাশি দুখানি খাটে ঘুমোচ্ছে রিণ্টু আর বাবলি। প্রমিতা রিণ্টুকেই বেশী ভালোবাসে। দুই ভাইবোনে ঝগড়া হলে প্রমিতা ঠিক মতন বিচার না করে বেশীর ভাগ সময়ই বকে বাবলিকে, সেইজন্যই বোধ হয় বাবলির প্রতি শৈবালের বেশী টান।

প্রমিতা বলল, আমি দু'বার উঠে এসে এসে দেখলাম।

শৈবাল রিণ্টুর কপালে হাত রাখল। একেবারে স্বাভাবিক তাপ।

না না, কিছু হয়নি।

থার্মোমিটার দিয়ে দেখব ?

কোন দরকার নেই। আমি বলছি তো, ঠিকই আছে।

রিণ্টুর কপালে একটি কাল্পনিক ফুস্কুড়ির ওপর হাত রেখে প্রমিতা আবার ভয়ার্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, দ্যাখ তো, এখানে একটা গোটা উঠছে না ?

শৈবাল রিণ্টুর কপালে ভালো করে হাত বুলিয়ে কোথাও কিছু পেল না।

প্রমিতা রিণ্টুর জামার বোতাম খুলে বুকে হাত বুলিয়ে ফুস্কুড়ি খুঁজতে লাগল।

দৃশ্যটা হঠাৎ খুব ভালো লেগেছে শৈবালের। প্রমিতা এখন খাঁটি মাতৃমূর্তি। মায়ের

প্রাণ সন্তানের জন্য অকারণে উদ্বিগ্ন। বাবারা এতটা পারে না।

শৈবাল একবার বাবলিরও কপালে হাত দিয়ে দেখলে। না, বাবলির জ্বর আসেনি!

প্রমিতার পিঠে হাত দিয়ে সে কোমল গলায় বলল, চল, ঘুমোবে চল। কিছু হয়নি ওদের। তাছাড়া হলেই বা কি? বলেছি তো, চিকেন পক্স হলেও ভয়ের কিছু নেই।

ছেলেমেয়েদের ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে প্রমিতা তার স্বামীর বুকে মাথা হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

॥ ছয় ॥

শৈবাল যা আশঙ্কা করেছিল সকালবেলাতেই ঠিক তাই ঘটল।

রিণ্টু, বাবলি কারুরই জ্বর হয়নি বা শরীরে গোটা বেরোয়নি, ওরা দুজনেই তৈরি হচ্ছে স্কুলে যাবার জন্য। প্রমিতার মনটা খুশি খুশি আছে।

আজ প্রমিতা ঘুম থেকে উঠেছে সকলের আগে, আর চা বানিয়েছে সে নিজে। প্রমিতার চায়ের হাতটা বেশ মিষ্টি।

বাবলি বাথরুমে ঢুকছে তাই শৈবাল খবরের কাগজটা পড়ছিল। সামনে তার দ্বিতীয় কাপ চা। মাঝে মাঝে হেঁকে উঠছে, বাবলি, তাড়াতাড়ি কর।

এমন সময় তিনতলার ভাড়াটে হিমাংশুবাবুর প্রবেশ।

হিমাংশুবাবুর বয়েস শৈবালের চেয়ে কিছু বেশী, রোগা লম্বাটে চেহারা। সকালবেলাটা উনি পাজামার ওপর হাওয়াই শার্ট পরে থাকেন। ঐ সাজেই তিনি খুব ভোরে বাজারে যান।

শৈবালের মত এক ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে চাকরি করতেন হিমাংশুবাবু। কিছু দিন হল সে চাকরি ছেড়ে স্বাধীন ব্যবসা শুরু করেছেন। খুব তাড়াতাড়িই সে ব্যবসাতে শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে মনে হয়, কেননা, গত মাসে তিনি একটি সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়ি কিনেছেন।

শৈবাল হিমাংশুবাবুকে দেখে তাড়াতাড়ি টেবিল থেকে পা নামিয়ে বলল, আরে, এই যে আসুন! বসুন!

হিমাংশুবাবু চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বললেন, অফিস যাবেন না?

শৈবাল বলল, হ্যাঁ। এইবার তৈরি হব।

আপনাদের অফিসের সেনগুপ্ত শুনলাম ব্রিটিশ কেব্‌লসে জয়েন করেছে?

এখনো করেনি, তবে সেই রকমই শুনছি।

একদিন একটু সামান্য ঝড় বৃষ্টি হয়েই থেমে গেল। আবার গরম। এই সময়টা খুব খারাপ।

হুঁ।

তার ওপর আবার লোড শেডিং ! ওঃ !

শৈবাল আড়ষ্ট হয়ে রইল। হিমাংশুবাবু নিশ্চয়ই এই সব এলোমেলো কথা বলতে আসেননি। অফিসের দিনে সকালবেলা কেউ এ রকম আমড়াগাছি গল্প করতে আসে না। হিমাংশুবাবুও তো চাকরি করতেন।

এক কাপ কফি খাবেন নাকি ?

না থাক, আপনার আবার দেরি হয়ে যাবে।

আরে না না, এক কাপ কফি খাবেন, তাতে আর কি দেরি।

শৈবাল সতর্ক হয়েই চায়ের বদলে কফির কথা বলেছে। চা বানাতে দেরি লাগে আর কফি তো একটু গরম জলে নেসকাফে গুলে দিলেই হয়। প্রমিতা ব্যস্ত থাকলে শৈবাল নিজেই বানিয়ে দিতে পারবে।

হিমাংশুবাবু বললেন, কফি আমার ঠিক সহ্য হয় না। চা হলে খেতে পারি !

প্রমিতা মিথ্যে কথা বলা পছন্দ করে না। কিন্তু শৈবাল অফিসে চাকরি করে, প্রায়ই নানা কারণে তাকে মিথ্যে বলতে হয়। প্রমিতা কাছাকাছি নেই দেখে সে মুখে দারুণ একটা লজ্জিত ভাল ফুটিয়ে বলল, এই রে, বাড়িতে যে আর চা নেই। লাস্ট কাপ আমিই খেয়ে ফেললাম !

থাক, থাক তাহলে।

চা বানাতে গেলে হিমাংশুবাবুর সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা বলতে হত। সেটা এড়ানো গেল। এবার আসল কথা। শৈবাল ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে রইল হিমাংশুবাবুর মুখের দিকে।

আপনাদের এখানে যে কাজ করে, অনন্ত নাম না ? অনন্তকে দেখলাম সিঁড়ির নিচে শুয়ে আছে !

শৈবাল শঙ্কিতভাবে চুপ করে রইল।

ওর সারা মুখে গোটা...পক্স হয়েছে ?

হ্যাঁ। চিকেন পক্স।

সুযোগে পেলে অনেকেই দয়ালু এবং মানব-দরদী সাজতে চায়। শৈবালের দিকে একটা ভর্ৎসনার দৃষ্টি দিয়ে হিমাংশুবাবু বললেন, সিঁড়ির নিচে ঐটুকু জায়গা, তার

মধ্যে ঘুচিমুচি হয়ে শুয়ে আছে ছেলেটা, জ্বরে কোঁকাচ্ছে, ওকে ঐভাবে ফেলে রেখেছেন ?

শৈবাল অপরাধীর মতন চুপ করে রইল।

হাজার হোক একটা মানুষ তো। ঝি-চাকর...ওরা আমাদের বাড়িতে কাজ করে, আমরাও যদি ওদের না দেখি...

ওকে ডাক্তার দেখিয়েছি, ওষুও খাওয়ানো হচ্ছে।

তা বলে ঐ রকম একটা অন্ধকার অস্বাস্থ্যকর জায়গায় ফেলে রাখবেন ?

এইবার শৈবাল পাল্টা চাল দিল। সে বিনীত ভাবে বলল, কি করা যায় বলুন তো ! কোন হাসপাতালে নেবে না। ফ্ল্যাটের মধ্যে এনে রাখাও সম্ভব নয়, আমার ছোট ছেলেমেয়ে আছে।

এবার হিমাংশুবাবু স্বমূর্তি ধরলেন। একটু উগ্রভাবে বললেন, তা বলে কমন প্যাসেজের কাছে ওকে ফেলে রাখবেন ! সাড়া বাড়িতে রোগ ছড়াবে ! আপনার ফ্লাটে ছোট ছেলেমেয়ে আছে, আমার ফ্ল্যাটে নেই ! আমার ছোট মেয়েটার আবার সামনেই পরীক্ষা।

অর্থাৎ মানব দরদ-টরদ কিছু না, নিজেদেরও রোগ হবার ভয়।

এই সময় শয়নকক্ষ থেকে প্রমিতা এসে সেখানে দাঁড়াল।

প্রমিতা যাতে চায়ের প্রস্তাব দিয়ে না বসে, সেইজন্য শৈবাল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, হিমাংশুবাবু কফি-টফি কিছু খাবেন না বলেছেন।

হিমাংশুবাবু প্রমিতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, অনন্তর কথা বলছিলাম। সিঁড়ির নিচে পড়ে আছে, দেখতেও খারাপ লাগে, সারা বাড়িতে রোগ ছড়াবে। কাজরির সামনেই পরীক্ষা, এখন, পক্স-টক্স হলে কি বিপদ হবে বলুন তো !

প্রমিতা নিজের দায়িত্ব সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে অম্লান মুখে বলল, দেখুন না। আমিও সেই কথাই বলছিলাম ওকে, একটা কিছু ব্যবস্থা না করলে—

শৈবাল শুকনো গলায় বলল, কি ব্যবস্থা করা যায়, শুনি ?

প্রমিতা এবং হিমাংশুবাবু প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠলেন, ওকে ওর বাড়িতে পাঠিয়ে দিন।

শৈবাল বলল, ওর বাড়ি অনেক দূর। এই অবস্থায় ও তো একলা যেতে পারবে না, সঙ্গে কারুর যাওয়া দরকার। কে যাবে ?

এবার প্রমিতা চুপ করে গেল। হিমাংশুবাবু বললেন, সে একটা কিছু উপায় তো করতেই হবে। এ রকম ভাবে তো ফেলে রাখা যায় না। সারা বাড়ির একটা রিস্ক।

এ বাড়িতে আরও অনেক লোক থাকে।

অর্থাৎ, তোমার বাড়ির চাকর, সুতরাং তার সব দায়িত্ব তোমার। আমরা তা নিয়ে মাথা ঘামাতে যাব কেন?

রাগ চাপবার জন্য শৈবাল ফস করে একটা সিগারেট ধরাল।

হিমাংশুবাবু আফসোসের সুরে বললেন, বাজার যাবার পথে আমি ওকে লক্ষ্যই করিনি। বাজারে আজ বড় বড় মাগুর মাছ উঠেছে, দামও তেমন চড়া নয়, এক কিলো কিনে ফেললাম। কি কাণ্ড বলুন তো? এখন সে মাছ কে খাবে? বাড়িতে পক্স হলে মাছ-মাংস কিছুই খেতে নেই। আমরা ছেলেবেলা থেকে দেখছি, বাড়িতে পক্স হলে বাপ-মা আমাদের নিরামিষ খাওয়াতেন।

প্রমিতা যেন লজ্জায় একেবারে মাটিতে মিশে যাবে!

শৈবাল মনে মনে হিমাংশুবাবুকে উদ্দেশ্য করে বলল, তুমি একটি গর্দভ, তোমার মাথায় গোবর পোরা!

একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে শৈবাল পড়েছে যে পক্সের সময় বেশী করে মাছ মাংস খেতে হয়। আগেকার দিনে গ্রামের লোক যে পুকুরে পক্সের রুগীর কাপড়-চোপড় ধুতো, সেই পুকুরের মাছ খেত না। কলকাতার বাজারে এব মাছ আসে ভেড়ি থেকে, সে মাছের কিছু দোষ নেই। বেশী করে প্রোটিন খেলে পক্স আটকানো যায়। যারা গোরু-শুয়ারের মাংস বেশী খায়, তাদের সচরাচর পক্স হয় না। শৈবাল নিজেই তো ভেবেছিল, আজ নিউ মার্কেট থেকে ফেরবার পথে এক কিলো গরুর মাংস কিনে আনবে। গোরুর মাংসে বেশী প্রোটিন থাকে। প্রমিতাকে অবশ্য বলত, ভেড়ার মাংস।

হিমাংশুবাবু তাঁর এক কিলো মাগুর মাছ এ ফ্ল্যাটে পাঠিয়ে দিলে শৈবাল খেয়ে বাঁচত। মাগুর মাছ তার খুব পছন্দ। পঁচিশ টাকা কেজি বলে সে প্রাণে ধরে কিনতে পারে না। কিন্তু সে কথা হিমাংশুবাবুকে মুখ ফুটে বলা যাবে না।

হিমাংশুবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তাহলে তাড়াতাড়ি একটা কিছু ব্যবস্থা করুন। আমাদের সকলের স্বার্থে।

হ্যাঁ, স্বার্থে। স্বার্থের কথাই যখন বলতে এসেছিলে, তখন গোড়ায় লম্বা লম্বা লেকচার মারছিলে কেন?

শৈবাল গম্ভীরভাবে বলল, হ্যাঁ, দেখছি। আমি অফিস যাবার আগেই একটা কিছু ব্যবস্থা করছি।

হিমাংশুবাবু চলে গেলে প্রমিতা বলল, তোমার আজ অফিস না গেলে চলে না?

ম্যানেজিং ডাইরেক্টারকে তো ফোন করে একটা কিছু বলতে হবে। এমনি এমনি

তো ডুব মারা যাবে না। তা ফোন করে কি বলব, চাকরের পক্স হয়েছে বলে আমি আজ অফিসে যেতে পারছি না। উনি যদি হেসে ওঠেন ?

তোমার তা হলে যা খুশি তাই কর। শুনলে তো, অনন্তকে ওখানে ফেলে রাখা যাবে না।

শোন প্রমিতা। ধরা যাক, অনন্তকে দেশে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা গেল। কিন্তু এই অবস্থায়.....সেটা তো তাকে তাড়িয়ে দেবার মতন একটা ব্যাপার ! তারপর সুস্থ হয়ে সে যদি আর এখানে ফিরে আসতে না চায় ? ধর, আর এলো না ! তাহলে ?

তাহলে কী ? না এলে কী করা যাবে ! ও ছাড়া কি আর কাজের লোক নেই ?

ও রকম একজন বিশ্বাসী লোক।

খুঁজলে ও রকম আরও পাওয়া যাবে।

আমাকেও আমার অফিস থেকে যদি এই রকম ভাবে কোন দিন তাড়িয়ে দেয় ? আমি চাকরি করি, সে-ও তো চাকরেরই কাজ। অনন্ত যেমন চাকর, আমিও তেমনি চাকর।

ফের ঐ রকম বড় বড় কথা ! তোমার একটুও প্র্যাকটিক্যাল সেন্স নেই। আর শোন, তোমাকে আর একটা কথা বলি। সবার সামনে ওদের অমনি চাকর চাকর বলবে না। শুনতে ভারি খারাপ শোনায়। আজকাল সবাই কাজের লোক বলে।

সবার সামনে কোথায় বললাম ? শুধু তো তুমি আছ ! তারপর আপনমনে সে বলল, ওরা কাজের লোক, আর আমরা অকাজের লোক।

রিন্টু এই সময় এসে জিজ্ঞেস করল, বাবা অনন্তদা, সিঁড়ির তলায় শুয়ে কেন ?

শৈবাল বলল, ওর অসুখ করেছে।

বাবা জানো, সিঁড়ির তলার ঐ জায়গাটায় একদিন একটা তেঁতুলে বিছে বেরিয়েছিল, এই অ্যা—ত্-তো বড় ! অনন্তদাই দেখতে পেয়েছিল সেটা।

খবরের কাগজে চোখ নিবদ্ধ রেখে শৈবাল অন্যমনস্কভাবে বলল, তারপর ?

অনন্তদা আমার পা থেকে জুতো খুলে নিয়ে সেই জুতো দিয়ে বিছেটাকে চিপটে চিপটে মারল। একদম মরে গেল বিছেটা।

বাঃ বেশ !

বাবা, আর একটা যদি অনন্তদাকে কামড়ে দেয় ?

দেবে না।

যদি দেয় ?

অনন্তদা ওখানে থাকবে না। আজই চলে যাবে।

কোথায় ? অনন্তদা কোথায় যাবে ?

এবার শৈবাল এক ধমক দিয়ে বলল, তখন থেকে কেন আমায় বিরক্ত করছ ? দেখছ না, কাগজ পড়ছি। সকাল থেকে মন দিয়ে কাগজ পড়ারও উপায় নেই। ব্যাগ গুছিয়েছ ? ইস্কুলে যেতে হবে না ?

ধমক খেয়ে রিন্টু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। অনন্ত ওর খেলার সঙ্গী। যে সব দিনে শৈবাল আর প্রমিতা একসঙ্গে সন্ধের শো-তে ইংরেজি অ্যাডাল্ট সিনেমা দেখতে যায়, বাবলি যায় নাচের স্কুলে, সে-সব সন্ধেবেলা রিন্টু অনন্তর তত্ত্বাবধানে থেকেছে। অনন্ত নানা রকম খেলা দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছে ওকে।

অনন্ত কোথায় যাবে, তার উত্তর তো শৈবাল নিজেই জানে না। সুতরাং ছেলেকে ধমক দেওয়া ছাড়া উপায় কী ? তবে ধমকটা একটু বেশী জোরে হয়ে গেছে।

শৈবাল তাকিয়ে দেখল, অদূরে দাঁড়ানো প্রমিতার দু'চোখে জল ভরা মেঘ।

বাড়িতে শৈবালের একটু প্রাণ খুলে রাগ করারও উপায় নেই। আগেই প্রমিতা কান্না শুরু করে দিয়ে জিতে যায়। খবরের কাগজটা মাটিতে ফেলে দিয়ে শৈবাল উঠে দাঁড়াল। এবার তাকে একটা কিছু করতেই হবে।

শৈবাল মনে মনে আদর্শবাদী এবং মার্ক্সীয় মতে সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু সে ততখানি আদর্শবাদী কিংবা তত বেশী সমাজতান্ত্রিক নয় যে গৃহভৃত্যের পক্স হলে তাকে নিজের বাড়িতে রেখে সেবা শুশ্রূষা করবে, কিংবা তাকে সঙ্গে নিয়ে সুদূর গ্রামাঞ্চলে পৌঁছে দিয়ে আসবে অফিস কামাই করে। অর্থাৎ সেও অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বাঙালীর মতন একজন ভণ্ড, মুখে যা বলে, কাজে তা করে না। কিংবা অন্যের যে-দোষ দেখে সে সমালোচনা করে, নিজেও ঠিক সেই দোষটিই করে।

কিছু টাকা দিয়ে যদি ব্যাপারটার একটা সুরাহা করা যেত, তাহলেই শৈবাল তার বিবেকের খোঁচাটুকু সামলে নিতে পারত। টাকা দিয়ে অনন্তকে কোথাও রাখা যায় না ? অনন্তর মতন একজন বিশ্বাসী কাজের লোককে হারানোর প্রশ্নটাও তার মনে উঁকি মারছে। যতদিন পর্যন্ত আর একটি এই রকম লোক পাওয়া না যায় ততদিন বাড়িতে শান্তি থাকবে না।

শৈবাল দ্রুত চিন্তা করতে লাগল। সাধারণ হাসপাতালে পক্সের রুগী নেয় না। শৈবালের মনে পড়ল, তার অফিসের এক কলিগের ছেলের টিটেনাস হবার পর তাকে বেলেঘাটার দিকে একটা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সেটির নাম আই ডি হসপিটাল। সেখানে ছোঁয়াচে রুগীদের নেয়।

শৈবাল আই-ডি-হসপিটালে ফোন করতে গেল।

অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর টেলিফোন লাইন যদিও বা পেল, সেখান থেকে তার প্রশ্নের উত্তরে তাকে শুনতে হল ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ভরা এক বিচিত্র উত্তর।

কে একজন ভদ্রলোক বললেন, হাসপাতালে এমনিতেই তিল ধারণের জায়গা নেই। নতুন রুগী নেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া চাকরের চিকেন পক্স হয়েছে বলে শৈবাল তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে চাইছে, এজন্য তার লজ্জা করে না? কলকাতার চতুর্দিকে এখন চিকেন পক্স হচ্ছে। এটা একটা বিরক্তিকর নিরীহ অসুখ। তবু সবাই যদি চিকেন পক্স হলেই হাসপাতালে থাকার বিলাসিতা করতে চায়, তাহলে সারা দেশে অন্তত এক হাজারটা নতুন হাসপাতাল খোলা দরকার!

শৈবাল দুম করে রেখে দিল ফোনটা।

এরপর তিনতলারই আর একজন ভাড়াটে সুখেন্দুবাবু এসে বললেন, ও মশাই, আপনাদের চাকরের নাকি—

শৈবাল বলল, যাচ্ছি যাচ্ছি, এক্ষুনি ব্যবস্থা করছি।

দরজার কাছে এসে সে তিক্ত গলায় প্রমিতাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, শুনুন সুখেন্দবাবু, আজকাল চাকর বলতে নেই, বলবেন কাজের লোক। চাকর শুধু আমরাই, যারা অফিসে কাজ করি!

এ রকম কথায় বেশ কাজ হলো। সুখেন্দুবাবু কেটে পড়লেন তৎক্ষণাৎ।

দুটি অ্যাসপিরিন জাতীয় ট্যাবলেট খুঁজে বার করে, তারপর শৈবাল নিজেই এক গেলাস জল গড়িয়ে নিয়ে পা বাড়াল বাইরে।

প্রমিতা জিজ্ঞেস করল, ও কি, জল নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?

শৈবাল কোন উত্তর দিল না।

তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে শৈবাল অনন্তর কাছে উবু হয়ে বসল।

এই গরমের মধ্যেও অনন্ত একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।

অন্য দিন এই সময় অনন্ত অনবরত ছুটোছুটি করে। ভোরে উঠেই দুধ আনা, তারপর বাজার করা, তারপর রিন্টু-বাবলির খাবার। তাদের টিফিনের কৌটো গুছিয়ে দেওয়া, তারই মধ্যে শৈবালের জন্য ভাত—

আজ এখন সে প্রায় অসাড়, নিস্পন্দ। মুখখানা কুঁচকে আছে।

শৈবাল আস্তে আস্তে ডাকল, অনন্ত, অনন্ত!

অনন্ত মুখ না ফিরিয়েই বলল, উঁঃ?

এখন কেমন আছিস?

উঁ?

কেমন আছিস? জ্বর কমেছে?

ব্যথা। গায়ে খুব ব্যথা।

নে, এই ওষুধটা খেয়ে নে।

ওষুধ দুটো আর জলের গেলাস নামিয়ে রেখে সে সরে গেল একটু দূরে। অনন্ত বিনা বাক্যব্যয়ে ওষুধ ও জল খেয়ে শুয়ে পড়ল আবার। বেশ একটু আত্মপ্রসাদ বোধ করলো শৈবাল। সে অনন্তকে নিজের হাতে সেবা করেছে।

অনন্ত শোন, তুই তো এখানে শুয়ে থাকতে পারবি না। এ রকম অন্ধকার গুমোটের মধ্যে...তাতে আরও খারাপ হবে। তোর এখন কিছু দিন বিশ্রাম দরকার, চুপচাপ শুয়ে থাকা দরকার। এই অসুখের তো আর তেমন কোন চিকিৎসা নেই, শুধু বিশ্রাম। তুই বরং ক'দিন ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে যা—এই অনন্ত!

অনন্ত যেন শুনতেই পাচ্ছে না, কোন সাড়া শব্দ নেই।

শৈবাল একটু গলা চড়িয়ে ডাকল, এই অনন্ত! ওঠ্। এবারে উঠে বোস।

এবার অনন্ত উঠে বসে দেয়ালে হেলান দিয়ে শৈবালের দিকে তাকাল। স্থির দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে কোন রাগ, দুঃখ, অভিমান কিছুই নেই। নিছক ভাষাহীন, ম্লান ভাবে চেয়ে থাকা। চোখ দুটি ঈষৎ লাল্চে, ঘোলাটে।

কী বলছেন, দাদাবাবু?

তুই বাড়ি চলে যেতে পারবি না? যদি একটা রিক্শায় তুলে দিই।

বাড়ি?

হ্যাঁ, তোর বাড়ি। ক'দিন বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম নে। দেখবি, গ্রামের খোলামেলা হাওয়ায় তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে উঠবি। তোকে রিক্শার তুলে দেব এখান থেকে, তারপর বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠে পড়বি। কি রে পারবি না?

অনন্ত ঘাড় হেলাল।

শৈবাল আর দ্বিরুক্তি না করে দৌড়ে উঠে গেল ওপরে। টেবিলের ড্রয়ার খুলে এক খামচা টাকা নিয়ে আবার নেমে এলো নিচে। ভাগ্যিস মাসের প্রথম, তাই উট্কো খরচ করা যায়।

অনন্তর এক মাসের অতিরিক্ত মাইনের সঙ্গে শৈবাল আরও দশ টাকা যোগ করল। একটু দ্বিধা করে আরো দশ। তারপর টাকাটা গোল্লা করে পাকিয়ে অনন্তর দিকে ছুড়ে দিয়ে শৈবাল বলল, নে, তোর সব জিনিস-পত্তর গুছিয়ে নে।

অনন্ত আবার চোখ বুজে ঝিম মেরে বসে আছে।

শৈবাল তাড়া দিয়ে বল্ল, নে নে, গুছিয়ে নে সব, আমি রিক্শা ডেকে আনছি।

সকালবেলা স্কুলের সময়টাতে ট্যাক্সির মতনই রিক্‌শাও দুর্লভ। বেশীর ভাগ রিক্‌শাওয়ালারই এই সময় বাঁধা কাজ থাকে। বালিগঞ্জ স্টেশান কাছেই, এক টাকার বেশী ভাড়া হয় না। দেড় টাকা কবুল করে শৈবাল ধরে আনল একজন রিক্‌শাওয়ালাকে।

অনন্ত তখনো গোছগাছ করেনি দেখে শৈবাল মৃদু ধমক দিয়ে বলল, কি রে, চুপ করে বসে আছিস যে? বাড়ি যাবি না? বললাম যে—

অনন্ত বলল, ও—। তারপর সে হাত বাড়িয়ে কম্বল আর কাপড় চোপড় পুঁটলি করতে লাগল।

অন্যদিন অনন্ত কত চটপটে থাকে। আজ যেন তার হাত চলছেই না। তার গা থেকে যেন জ্বরের তাপ ঠিকরে বেরুচ্ছে। শৈবাল অনন্তর দিকে চেয়ে থাকতে পারছে না। তার গা শিরশির করছে।

যদি রিক্‌শাওয়ালা চলে যায়! কিংবা অনন্ত মত বদলে ফেলে? শৈবাল আর ধৈর্য রাখতে পারছে না।

বাড়িতে গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম নিলেই তুই সেরে উঠবি। এই যে ওষুধ দিলাম। দেখবি। ওতেই কাজ হয়ে যাবে।

অনন্তর মুখে কোন কথা নেই। সে একা দাঁড়াল অতি কষ্টে।

অনন্তর টিনের সুটকেসটাও প্রমিতা নিচে রেখে গিয়েছিল, সেটা শৈবাল নিজেই তুলে দিল রিক্‌শায়। অনন্তও নড়বড়ে পায়ে হেঁটে গিয়ে রিক্‌শায় উঠল।

রিক্‌শাওয়ালারা পক্সকে বলে হৈজা। ওরা হৈজাকে খুব ভয় পায়। যদি বুঝতে পারত যে অনন্তর হৈজা হয়েছে, তাহলে নিশ্চয়ই রিক্‌শাতে তুলতই না। এই রিক্‌শাওয়ালাটি বোধ হয় একটু বোকা বোকা ধরনের, সে খেয়াল করল না অত কিছু। তাড়াতাড়ি করার জন্য সে ঠং ঠং শব্দ করতে লাগল অধীরভাবে।

শৈবাল অনন্তকে জিজ্ঞেস করল, কি রে, যেতে পারবি তো?

মুখে কোন উত্তরের শব্দ না করে অনন্ত ঘাড় হেলাল।

রিক্‌শাওয়ালার দেড় টাকা ভাড়া শৈবালই দিয়ে দিল আগে। তারপর আর দুটি টাকা রিক্‌শাওয়ালার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, ইসকা বোখার হ্যায়, ইসকো ট্রেনমে উঠা দেগা, সমঝা? থোড়া দেখ ভাল কর না?

যেটুকু বিবেকের খোঁচা অবশিষ্ট ছিল, তা ঐ দু'টাকা দেওয়ায় একেবারে নির্মূল হয়ে গেল।

ব্যাপারটা যে এত সোজা, তা শৈবাল আগে বুঝতেও পারেনি। সে একটু বেশী

বেশী বাড়িয়ে তুলছিল। সে ভেবেছিল, কেউ সঙ্গে করে পৌঁছে না দিলে অনন্ত যেতেই পারবে না। এই তো স্বেচ্ছায় অনন্ত দিব্যি চলে গেল। তাকে জোর করে তাড়িয়ে দেওয়াও হয়নি। ওরা গ্রামের লোক, ওরা অনেক কিছু সহ্য করতে পারে।

অনন্ত রিক্‌শাতে উঠেই ঘাড় কাৎ করে শুয়ে রইল এক পাশে। এই সব কাজের লোকেরা সব সময়ই ব্যস্ত থাকে বলে, এদের নির্জীব অবস্থায় দেখলে যেন কেমন অদ্ভুত লাগে। শৈবাল এর আগে কোনো ঝি-চাকরের অসুখ দেখেনি। তার কেমন যেন ধারণা ছিল, ওদের অসুখ হয় না। সব সময় এক্সসারসাইজ করে কি না!

ছেলেটা আবার ফিরে আসবে তো? সত্যিই কাজের ছেলে ও।

ভালো হয়ে গেলে চলে আসিস কিন্তু?

রিক্‌শাটা চলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে হুস্ করে একটা ফিয়াট গাড়ি এসে থামল এই বাড়ির সামনে। আর একটু হলে রিক্‌শাটাকে ধাক্কা মেরে দিচ্ছিল আর কি।

গাড়ি চালাচ্ছে ইরা।

পিছনের দরজা খুলে দিয়ে ইরা ব্যস্তভাবে বলল, নাম, নাম, শিগগির কর!

শৈবাল যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না! ইরার গাড়ি থেকে নামছে হেনা নামের সেই মেয়েটি, তার হাতে কাপড়ের পোঁটলা-পুঁটলি!

সেই মেয়েটি নামতে না নামতেই ইরা আবার গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে!

ইরার সব সময়ই ব্যস্ত-সমস্ত ভাব। সর্বক্ষণই যেন ছুটছে।

কাছে এগিয়ে এসে শৈবাল জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার?

ইরা দারুণ ছটপট করে বলল, একদম সময় নেই, এখন নেমে কথা বলতে পারছি না...প্রমিতাকে বলবেন দুপুরে ফোন করব, তখন সব জানাব, ও মেয়েটিকে আমাদের বাড়ি রাখা যাবে না...ওকে এখানে রেখে গেলাম...ওঃ, দেরি হয়ে গেছে, ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট....পরে সব জানাব, চলি!

যেমন এসেছিল, তেমনিই দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল ফিয়াট গাড়িটা।

শৈবালের ইচ্ছে হল, সেখানে দাঁড়িয়েই হু-র-রে বলে চেঁচিয়ে ওঠে।

এক মিনিটের মধ্যে একসঙ্গে দুটি সমস্যার সমাধান হয়ে গেল! শৈবালের মতন নাস্তিককেও তো তাহলে দেখছি ভগবানে বিশ্বাস করতে হয়!

॥ সাত ॥

সেদিন শৈবাল অফিস থেকে বাড়ি ফিরল, গরুর মাংস নিয়ে নয়, এক বাক্স কেক নিয়ে। তার মেজাজটা খুব ফুরফুরে আছে আজ।

আজ আর মদ খাবার জন্য ক্লাবে কিংবা তাসের আড্ডায় যেতে ইচ্ছে হয়নি। মনটা খুব উদার হয়ে গেছে, সে ঠিক করেছে সন্ধেটা সে একান্তই নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সঙ্গে কাটাবে। নানান ব্যস্ততার জন্য সে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বেশী কথাবার্তাও বলতে পারে না। এটা ঠিক নয়। রিডার্স ডাইজেস্টের একটা প্রবন্ধে সে পড়েছে যে এ কালের বাবা মায়েরা ছেলেমেয়েদের জন্য বেশী সময় দেয় না বলেই সামাজিক সমস্যা এত বাড়ছে।

আজই সকালে সে ছেলেকে বকেছে। সেটা অনুচিত।

এক একদিন পর পর ভালো ঘটনা ঘটতে থাকে। আবার যেদিন খারাপ কিছু দিয়ে শুরু হয়, সেদিন শুধু খারাপই চলে। আজ সকালে গোড়ার দিকটা খুবই গোলমেলেভাবে শুরু হয়েছিল, তারপর অনন্তর ব্যাপারটা সমাধান করার পর থেকেই সব কিছু ভালো হয়ে গেল। অফিসে অনেক দিনের একটা পেন্ডিং কেস অপ্রত্যাশিতভাবে মীমাংসা হয়ে গেছে আজ।

তাছাড়া, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর তাকে আগামী মাসে একবার নেপাল ঘুরে আসতে বলেছেন। ঘুরে আসলেই বেশ কিছু পয়সা পকেটে আসে। এমন কি, ইচ্ছে করলে শৈবাল প্রমিতা আর ছেলেমেয়েদেরও নিয়ে যেতে পারে নেপালে বেড়াতে। ঐ অফিসের খরচেই হয়ে যাবে। সামনের মাসে ছেলেমেয়েদেরও স্কুলের ছুটি পড়ে যাচ্ছে।

বাড়ি ফিরে শৈবাল দেখল, হেনা নামের মেয়েটি কোমরে আঁচল জড়িয়ে রান্নাঘরে রান্নায় মেতে গেছে। আর প্রমিতা তাকে শেখাচ্ছে।

রান্না করতে ভালো না বাসলেও রান্না শেখাবার ব্যাপারে প্রমিতার খুবই উৎসাহ। প্রত্যেকবার নতুন রান্নার লোক এলে নতুন করে শেখাতে প্রবৃত্ত হয়।

প্রমিতার রান্না শেখাবার প্রধান অঙ্গ অবশ্য কি করে রান্নাঘর পরিষ্কার রাখতে হয়, সেই প্রণালী মুখস্থ করানো। রান্নায় নুন কম হোক কিংবা বেগুন ভাজতে গিয়ে

পুড়ে যাক, তাতে খুব একটা আপত্তি নেই প্রমিতার, কিন্তু রান্নাঘরের মেঝে ভিজে স্যাঁতসেঁতে হয়ে থাকলে কিংবা তরকারির খোসা এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে থাকলেই সে রেগে আগুন হবে।

শৈবালকে দেখেই প্রমিতা বলল, তুমি হাত মুখ ধুয়ে নাও, আমি আসছি। চা খাবে তো ?

ঠিক অফিস ছুটির পরই শৈবাল আজ বাড়ি ফিরেছে বলে প্রমিতা খুব খুশি। পুরুষমানুষ একবার বাড়ি থেকে বেরুলে আর সহজে ফিরতে চায় না।

ঝট করে গা-টা ধুয়ে পায়জামা আর পাঞ্জাবি পরে ফেলল শৈবাল। তার চা ঢাকা দিয়ে রাখা আছে শোবার ঘরের বেড সাইড টেবিলে। প্রমিতা আগেই চা খেয়ে নিয়েছে। তার সময় নেই, তাকে এখন থাকতে হবে রান্নাঘরে। অনন্ত নাকি রান্নাঘরটা একেবারে নরককুণ্ড করে রেখে গেছে, সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার না করলেই নয়।

চা খাওয়ার পর শৈবালের হঠাৎ খেয়াল হল, সে সিগারেট আনতে ভুলে গেছে। অফিস থেকে ফেরার পথে সে ভেবেছিল, পাড়ার মোড়ের দোকান থেকে কিনে নেবে।

সে হঠাৎ চেঁচিয়ে ডেকে উঠল, অনন্ত ! অনন্ত !

রান্নাঘর থেকে প্রায় ছুটে এসে প্রমিতা জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার ?

সিগারেট নেই, সিগারেট আনতে হবে, অনন্তকে একটু পাঠাবে ?

অনন্তকে তুমি কোথায় পাচ্ছ !

ফট্ করে শৈবাল লজ্জা পেয়ে গেল। সে একেবারে ভুলেই গিয়েছিল। সিগারেট ফুরিয়ে গেলেই অনন্তর নাম ধরে চ্যাঁচানো তার অভ্যেস।

পড়া ছেড়ে ওঠে বসে রিন্টুও বলল, অনন্তদাদা তো নেই। চলে গেছে !

এবার ছেলেকে আর না বকুনি দিয়ে, তার দিকে চেয়ে একগাল হেসে শৈবাল বলল, হ্যাঁ রে, একদম ভুলে গিয়েছিলুম। আমার কি রকম ভুলো মন দেখেছিস ! যা, তুই পড়তে যা।

বাবা, অনন্তদাদা আর আসবে না ?

হ্যাঁ, কেন আসবে না। অসুখ সেরে গেলেই আসবে।

রিন্টুকে কাছে ডেকে শৈবাল আদর করে হাত বুলিয়ে দিল তার চুলে। এই তো বেশ পিতা হিসাবে তার দায়িত্বের পরিচয় দেওয়া হলো। সন্তানদের শুধু বকাবকি করা উচিত নয়। মাঝে মাঝে বন্ধুর মতন ব্যবহার করতে হয়। শৈবালের কি তা ইচ্ছে করে না, নিশ্চয়ই করে। কিন্তু এই হতচ্ছাড়া অফিসের জন্য কি তার সময় পাওয়া যায়।

রিন্টু পড়ার ঘরে ফিরে গেল শৈবাল বলল, ঐ মেয়েটিকে দিয়ে সিগারেট আনানো যায় না, না?

প্রমিতা বলল, কেন, তুমি গিয়ে সিগারেট আনতে পারছ না? তুমি আজকাল বড্ড কুঁড়ে হয়ে যাচ্ছ কিন্তু!

প্রমিতার বোধ হয় ধারণা, শৈবাল সারাদিন অফিসে কুঁড়েমি করে এসেছে।

শৈবাল বলল, মেয়ে কাজের লোক নিয়ে এই এক অসুবিধে, যখন তখন বাইরে পাঠানো যায় না। সিগারেট-ফিগারেট আনতে গেলে...

প্রমিতা ভ্রূভঙ্গি করে বলল, কি অদ্ভুত বাংলা। অফিসে সব সময় ইংরেজি বলতে বলতে তোমরা একদম বাংলা-টাংলা গুলিয়ে ফেলছ!

কি ভুল বললাম?

মেয়ে কাজের লোক আবার কি? কাজের মেয়ে বলতে পারো না?

ওঃ হো, তাই তো! কাজের মেয়ে! তা এ মেয়েটি সত্যিই কাজের তো?

স্বভাবটা নরম আছে। শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে।

ইরা ওকে ফেরত দিয়ে গেল হঠাৎ?

সেইটাই তো বুঝতে পারছি না। দুপুর থেকে তিন চারবার ওকে ফোন করার চেষ্টা করলাম, একবারও বাড়িতে পাচ্ছি না।

মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করনি?

ও তো কিছুই বলতে পারছে না। খালি বলছে, আমি কিছু জানি না। ও বাড়ির দিদিমণি আজ সকালে হঠাৎ বললেন, তুই জিনিসপত্তর গুছিয়ে নে, তোকে ঐ দিদিমণির বাড়িতে রেখে আসব। কেন বললেন, তাও জানি না। বিশ্বাস করুন আমি কি দোষ করেছি, তাও জানি না!

ইরা আবার ওকে ফেরত নিতে আসবে না তো?

নিতে এলেই বা দিচ্ছে কে? বাবাঃ, লোক পাওয়া যা ঝঞ্ঝাট! কাল সন্ধেয় অন্তত সাত জায়গায় টেলিফোন করেছি। এই মেয়েটিকে রাখার আর একটা কি বড় সুবিধে জানো?

কি?

ওকে ছুটি-ফুটি দিতে হবে না একদম। ও বলছিল, ও গ্রামে আর যেতে চায় না। গ্রামে গেলে খেতে পাবে না। ওর বাবাটা পাষণ্ড, টাকা-ফাকা সব কেড়ে নেবে!

মেয়েটি গ্রামে গেলে খেতে পাবে না, সুতরাং ছুটিও নেবে না, এটা একটি সুবিধেরই ব্যাপার বটে।

শৈবালের একবার লোভ হলো প্রমিতাকে খোঁচা দিয়ে দু'একটা মন্তব্য করতে। তারপরই মনে পড়ল, আজ সন্ধেটা অন্যরকম।

প্রসঙ্গ পাল্টে শৈবাল জিজ্ঞেস করল, কেক এনেছি, ছেলেমেয়েদের দিলে না?

প্রমিতা বলল, ওরা বিকেলবেলা একগাদা ফুচকা-মুচকা খেয়েছে। বাড়িতে ডেকে এনেছিল। কেকগুলো থাক, কাল ওদের টিফিনে দিয়ে দেবে। তুমি সিগারেট আনতে গেলে না? আমি কিন্তু চললুম রান্নাঘরে।

শৈবাল বলল, সিগারেট কিনতে গিয়ে যদি চেনা কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, আর সে যদি টানতে টানতে অন্য কোথাও নিয়ে যায় আড্ডা মারার জন্য?

প্রমিতা তার নরম ডান হাতের মুঠিতে ছোট্ট কিল পাকিয়ে বলল, আজ সে-রকম কিছু করলে তোমায় এমন মারব!

আজ এ পরিবারে চমৎকার সুখ ও শান্তি।

শৈবাল বেরুবার মুখে প্রমিতা আবার বলল, ঠিক এক্ষুণি ফিরবে। আজ শুধু সেদ্ধ ভাতে ভাত, গরম গরম খেয়ে নিতে হবে। আর শোনো, দুটো মিষ্টি পান এনো তো!

সিগারেট কিনতে গিয়ে সত্যিই এক বন্ধু আর বন্ধুপত্নীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল শৈবালের। অরুণ আর মার্থা।

ওরা শৈবালকে দেখে বলল, এই যে, তোমাদের বাড়ি যাচ্ছিলাম।

আজ শৈবাল পুরো সন্ধেটা নিজের পরিবারের জন্য উৎসর্গ করবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, আজ এই রকম কেউ না এসে পড়লেই ভালো হত। কিন্তু ওরা অনেক দিনের বন্ধু, শৈবালকে হাসতেই হলো কৃত্রিম হাসি।

মার্থা গড়গড় করে সমস্ত বাংলা কথা বলতে পারে, যদিও উচ্চারণ যাচ্ছেতাই।

ওদের নিয়ে শৈবাল ফেরার পর প্রমিতা দরজা খুলতেই মার্থা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, প্রমিটা, ইউ মাস্ট হেল্প মী! আমার ভাবুণ বিপড! এমন অসুবিডায় পড়েসি।

অরুণ হাসতে হাসতে বলল, আরে আগে বসতে দাও, ঢুকতে না ঢুকতেই—

মার্থা বলল, ডেকেচো, ডেকেচো! অরুণ শুধু হাসে। আমাকে কোনো শাহায্যো কোরে না।

কারুর বিপদের কথা শুনলেই প্রমিতা খুব ঘাবড়ে যায়। সে ভুরু তুলে বলল, কি হয়েছে?

মার্থা বলল, আমাডের কাজের লোক আবার পালিয়েসে?

শৈবাল আর প্রমিতা চোখাচোখি করল,

অরুণ আর মার্থা দুজনেই চাকরি করে। ওদের একটি চার বছরের ছেলে আছে,

ওরা দুজনেই বেরিয়ে গেলে ছেলেকে কারুর কাছে তো রেখে যেতে হবে। বিশ্বাসী লোক দরকার।

প্রমিতাই অনেকবার ওদের জন্য কাজের লোক ঠিক করে দিয়েছে। আগে ওরা ছেলের বদলে শুধু মেয়ে চাইত। এখন আবার ওদের মত বদলে গেছে, মেয়ে চাই না, ছেলে চাই! কিন্তু ওদের বাড়িতে কাজের লোক বা কাজের ছেলে-মেয়ে বেশী দিন টেকে না। ওদের বাড়ির ম্লেচ্ছ পরিবেশ হয়তো বেশী দিন সহ্য করতে পারে না তারা। অরুণদের বাড়িতে নিয়মিত গাঁজা খাওয়ার আসর বসে। অল্পবয়সী আলোকপ্রাপ্ত এবং আলোকপ্রাপ্তা তরুণ তরুণীরা সেই আসরে যোগ দেয় এবং বাউল গান ও নিগ্রো স্পিরিচুয়াল্স বিষয়ে আলোচনা করে।

শেষ পর্যন্ত অরুণ তার এক দূর সম্পর্কীয়া বয়স্কা আত্মীয়াকে এনে রেখেছিল। আসলে বাড়ির দাসী, কিন্তু তাঁর নাম মাসী। তিনিও নাকি গতকাল হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছেন। কে জানে, কাশীর দিকে রওনা হয়েছেন কিনা!

অন্যান্য আমেরিকানদের মতন মার্থাও নাকি সুরে কথা বলে। কিন্তু কোন আমেরিকান যে অনবরত শুধু ঝি-চাকর বিষয়ে আলোচনা করতে পারে, তা মার্থাকে না দেখলে শৈবাল বিশ্বাসই করতে পারত না। শৈবালের এমন একটি দিনও মনে পড়ে না, যেদিন মার্থা ঐ বিষয় ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে কথা বলেছে। অথচ, শৈবালের ধারণা, আমেরিকায় ঝি-চাকরের প্রচলন নেই।

এই সময় হেনা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে মার্থার উদ্দেশে বলল, ভালো আছেন বৌদি?

কাজের লোক বা কাজের মেয়েদের এই এক স্বভাব! যে বাড়ি থেকে তাদের কাজ ছাড়িয়ে দিয়েছে বা যে বাড়িতে তাদের রাখেনি, সে বাড়ির লোকদের দেখলেও তারা হাসি মুখে কথা বলে।

হেনাকে দেখে আনন্দে, বিস্ময়ে মার্থার সারা মুখ চোখ একেবারে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যেন সমুদ্রে ডুবন্ত কোন মানুষ একটি ভাসমান ভেলা দেখতে পেয়েছে!

টুমি! টুমি অ্যাখুনো একানে আসো? টুমি চল্যে যাওনি?

তারপরেই মার্থা প্রমিতাকে জড়িয়ে ধরে বলল, প্রমিটা, টুমি অ্যাটো ডিন ওকে রেকে দিয়েস? হাউ নাইস অব ইউ! আ—অ্যাম ভে-র-রী, ভের-র-রী গ্রেটফুল টু য়্যু!

প্রতিমা নিরস ঠাণ্ডা গলায় বলল, ও এখন আমাদের এখানে কাজ করে।

মার্থা একেবারে আঁতকে উঠল। যেন হাত থেকে সেই ভেলাটা আবার কেউ কেড়ে

নিচ্ছে !— ও নো ! বাট হোয়াই ! টোমার টো কুব বালো একটা কাজের লোক আসে। টুমি ডুজনকে রাকটে চাও ? কাম নাও, প্রমিটা ! ইউ আর বিকামিং আ বুরঝোয়া।

অরুণ আপন মনে সিগারেটে গাঁজা পাকাতে শুরু করেছে। যে কোন জায়গায় গেলেই এটাই তার প্রথম কাজ। শৈবাল মুচকি মুচকি হাসছে।

প্রমিতার গলার স্বর গম্ভীর। সে বলল, দুজন লোক রাখব কি করে ? আমাদের আগের লোকটি চলে গেছে।

মার্থা বলল, সেই ছেলেটি ? অনন্ট ? সে টো খুব বিশ্বাসী কাজের লোক সিল !

প্রমিতা বলল, চলে গেছে। প্রমিতা মিথ্যে কথা বলে না। টেকনিক্যালি এটাও অবশ্য মিথ্যে নয়। অনন্ত নিজে থেকেই তো রিক্‌শায় চেপে চলে গেছে। তাকে তো জোর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়নি !

মার্থা শেষ চেষ্টা করে বলল, প্রমিটা, টুমি ওনেক লোক পাবে। টুমি এই মেয়েটিকে আমায় ডাও ! আমার খুব ডোরকার।

গলায় কোন কৌতুক নেই, তবু রসিকতার চেষ্টা করে প্রমিতা বলল, শোন, তুমি একবার ওকে ফেরত দিয়ে গেছ। আর তুমি ওকে চাইতে পারো না। আমাদের বাংলায় এটাই নিয়ম। আমি তোমাদের অন্য লোক খুঁজে দেব।

ওদের সান্ত্বনা দেবার জন্যই যেন প্রমিতা চায়ের সঙ্গে কেকের বাক্সটাও রাখল। ওদের সামনে। শোকে দুঃখে মার্থা তিন চারখানা কেক খেয়ে ফেলল। অরুণ ততক্ষণে সিগারেট-ভরা গাঁজায় কয়েক টান দিয়ে ফেলেছে, সে এবার দার্শনিক আলোচনা শুরু করবে।

ওরা উঠল রাত দশটায়।

যাবার সময় মার্থা বেশ কয়েকবার লোভাতুর দৃষ্টি দিয়ে গেল হেনার দিকে। সাম্রাজ্য গ্রাসের দিন আর নেই, নইলে মার্থা বোধহয় হেনাকে ধরে নিয়ে যেত।

ওরা চলে যাবার পর শৈবাল বলল, যাক্ !

প্রমিতা হেনাকে ডেকে তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ রে, তোর কি ওদের বাড়িতে কাজ করার ইচ্ছে ছিল ? তুই ওদের ওখানে যেতে চাস ?

হেনা বলল, না বৌদি। আমি এখানেই থাকব, আমি আর কোথাও যাব না।

তাহলে তুই ওদের সামনে অত ঘুর ঘুর করছিলি কেন ?

হেনা ফিক করে হেসে ফেলে বলল, মেমসাহেব তো, কি রকম করে যেন বাংলা কথা কয়, তাই শুনতে ভালো লাগে !

শৈবাল হো-হো করে হাসতে গিয়েও থেমে গেল। কে জানে প্রমিতা আবার কি

মনে করবে।

ঠিক সেই সময় ঝনঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন।

শৈবালই রিসিভার তুলল। ওপাশে ইরার গলা।

খুব কোমল, বিনীত গলায় ইরা বলল, আপনি তখন নিশ্চয়ই কিছু মনে করেছেন, গাড়ি থেকে নামিনি, ভালো করে কথা বলিনি, আমার নামা উচিত ছিল।

না না, তাতে কি হয়েছে।

আসলে ব্যাপার কি জানেন, আজ আমার সারাদিন এত কাজ, এমন টাইট প্রোগ্রাম....সকালবেলা ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট, তারপর ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা আরম্ভ আজ থেকে, ঠিক সময় উপস্থিত থাকতেই হবে, নাওয়া-খাওয়ার সময় পাইনি, দুপুরে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির একটা সেমিনার। তারপর বাড়ি ফিরতে না ফিরতেই....ছ'টার সময় আমার মেয়ের নাচের স্কুলের একটা ফাংশান, সেখানে না গেলে খারাপ দেখায়, সেখান থেকেই আবার ব্রিটিশ কাউনসিলের একটা পার্টি, বাইরে থেকে কয়েকটা সাহেব এসেছে—

ইরা এমনভাবে বলছে যেন এই প্রত্যেকটি কাজই ওর কাছে বিড়ম্বনা বিশেষ। অথচ এই সব প্রত্যেক জায়গাতেই ও যেতে ভালোবাসে। এর কোন একটা জায়গায় ওকে নেমন্তন্ন না করলে ও অপমানিত বোধ করে। এত সব কাণ্ড করেও ইরা বেশ হাসিখুশি থাকতে পারে।

শৈবাল জিজ্ঞেস করল, প্রমিতাকে দেব ?

হ্যাঁ, দিন না !

প্রমিতা ইশারায় জিজ্ঞেস করল, কে ?

শৈবালও কোন শব্দ উচ্চারণ না করে ওষ্ঠের ভঙ্গি করে জানাল, ইরা !

হেনা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল।

প্রমিতা তাকে বলল, এই, তুই রান্নাঘরে গিয়ে খাবার-টাবার গরম করত।

এরপর প্রমিতার সঙ্গে ইরার এক দীর্ঘ সংলাপ শুরু হল।

ইরা বলল, তোকে সারাদিন ফোন করতে পারিনি, এমন ব্যস্ত ছিলাম, প্রথমে ডাক্তারদের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট, তারপর...ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রমিতা বলল, আমিও তোকে ফোন করেছিলাম দু'বার—

হ্যাঁ, জানি, শুনেছি। কিন্তু বিকেলে বাড়ি ফিরেই...ইত্যাদি ইত্যাদি।

ও মা, তোর মেয়ের আজ নাচের ফাংশান ছিল বুঝি ? ঐটুকু মেয়ে....কেমন নাচল ? আমরা খবর পেলুম না, তাহলে আমরাও দেখতে যেতাম....কেমন নেচেছিল

কাবেরী ?

প্রমিতা ইচ্ছে করেই যেন হেনার প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাচ্ছে। ইরাও সরাসরি কোন কথা বলে না।

প্রায় মিনিট দশেক অন্যান্য বিষয় আলোচনা হবার পর ইরা বলল, ভাই প্রমিতা, সত্যি করে বল, তুই আমার ওপর রাগ করিসনি ? সত্যি, আমি খুব লজ্জিত।

প্রমিতা নিরীহ ভাব করে বলল, কেন, রাগ করব কেন ? কি হয়েছে ?

সকালবেলা দুম করে মেয়েটাকে তোদের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে গেলাম ! এটা আমাদের খুবই অন্যায়, তোর কাছ থেকে কাজের লোক নিয়ে আবার তোর কাছেই ফেরত পাঠানো...অরুণ-মার্থার মতন...আমি জানি ওরা যখন তখন এসে তোকে জ্বালাতন করে, আমি কিন্তু মোটেই তা চাইনি, আমি মেয়েটাকে বলেছিলাম ওর গ্রামে পাঠিয়ে দেব....কিন্তু ও গ্রামে যেতে চায় না, ও নাকি একলা একলা এখনো ট্রেনে চাপেনি, ওর সঙ্গে কারুকে যেতে হবে, কিন্তু আমি আর কাকে পাঠাই বল, তাই বাধ্য হয়েই তোর ওখানে...

ঠিক আছে, তাতে কিছু হয়নি।

তুই রাগ করিসনি ? অন্য কোথাও কাজ যোগাড় না হওয়া পর্যন্ত তোকেই তো ওকে খাওয়াতে হবে, তাছাড়া রাখাটাও একটা প্রবলেম, ঐ বয়েসী মেয়েকে যেখানে সেখানে শুতে দেওয়া যায় না।

প্রমিতা ঢোক গিলে বলল, ওকে এখন কিছু দিন আমার কাছেই রাখব ঠিক করেছি।

তুই দুজনকে রাখবি ! কক্ষনো রাখিস না....না....না, আমি খরচের জন্য বলছি না। তোর কাজের ছেলেটি আর ঐ মেয়েটি। কি যেন নাম, হেনা ? হ্যাঁ হেনা, ওরা কাছাকাছি বয়েসী, তোরা যখন বাড়িতে থাকবি না...শেষকালে একটা কেলেংকারির মধ্যে পড়বি। ডায়মণ্ডহারবারে লক্ষ্য করিসনি ? ওরা দু'জনে যেন সব সময় কাছাকাছি থাকতে চায়, না, না, আমি তোকে বলছি, প্রমিতা...

আমাদের অনন্ত কিছু দিনের জন্য ছুটি নিয়েছে। আজই বাড়ি চলে গেছে।

তাই নাকি ! ইরা উল্লাসের চিৎকারে টেলিফোন যন্ত্রটা আর একটু হলেই ফাটিয়ে ফেলছিল আর কি ! তাহলে তো তোকে এমনিতেই লোক খুঁজতে হত, যাক, তাহলে তোর ভালোই হল বল !

হ্যাঁ, তুই না জেনে আমার উপকার করে ফেলেছিস।

যাক, আমার মন থেকে একটা ভার নেমে গেল। সারাদিন এমন খারাপ লাগছিল।

মেয়েটা কিন্তু সত্যিই বেশ ভালো রে। নম্র, কথা শোনে, আমি রাখতে পারলুম না, আমার উপায় নেই।

কেন, কি হয়েছিল ?

সে এক লজ্জার ব্যাপার। মেয়েটার কিন্তু কোন দোষ নেই। ওর একমাত্র দোষ এই যে, ওর বয়েস কম, ওর শরীরে যৌবন আছে।

সেটা দোষের কেন হবে ?

সেই তো বলছি ! ওর কোন দোষ নেই ! দোষ আমাদেরই—

এরপর ইরা টেলিফোনেই ফিসফিস করতে লাগল। মোট কথাটা হল এই যে ইরার এক মামাতো ভাই সোমনাথ কিছুদিন হল এসে আছে ওদের বাড়িতে। ছেলেটি লেখাপড়ায় ব্রিলিয়ান্ট, দুর্গাপুরে ভালো চাকরি করে, ছ'মাসের একটা ট্রেনিং কোর্সের জন্য থাকতে হবে কলকাতায়। সেই সোমনাথ এখনো বিয়ে করেনি, তার জন্য পাত্রী খোঁজা হচ্ছে। সোমনাথ অত ভালো ছেলে হলেও প্রায়ই একটু-আধটু ড্রিংক করে। সে তো আজকাল অনেকেই করে, এমন কিছু দোষের নয়। কিন্তু সোমনাথের মারাত্মক একটি দোষ আবিস্কৃত হয়েছে দু'দিন আগে।

ইরাদের বাড়িতে ঝি-চাকরদের ব্যবহারের জন্য একতলায় একটি বাথরুম আছে, বাড়ির পিছন দিকে গ্যারাজের পাশে। তিনতলার ঝুল বারান্দায় একটি বিশেষ জায়গায় দাঁড়ালে যে সেই বাথরুমটির ভেতরটা দেখা যায় তা আগে কেউ জানত না। পরশু দিন সোমনাথকে সেখানে গভীর মনোযোগের সঙ্গে একদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ইরার খট্‌কা লেগেছিল। সোমনাথের মুখ-চোখের চেহারাই তখন অন্য রকম।

যাক, তখন ইরা সোমনাথকে কিছু বলেনি।

গতকাল সকালেও সোমনাথকে ছাদের ঠিক সেই জায়গাটায় সেই একই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। তখন ইরা আবার তিনতলারই অন্য একটি ঘরের জানালা দিয়ে লক্ষ্য রাখে সোমনাথের উপর। একটু পরেই একতলার বাথরুম থেকে ভিজে কাপড়ে হেনাকে বেরুতে দেখে সব ব্যাপারটা পরিস্কার হয়েছিল ইরার কাছে। তার অন্তরাত্মা অবশ্য ছি ছি করে ওঠেনি। ইরা বিদূষী মেয়ে, সে জানে, ফ্রয়েড বলেছেন, অনেক পুরুষমানুষের লোভ থাকে নিম্নজাতীয়া মেয়েদের উপর। ঝি, মেথরানী, গয়লানীদের প্রতি তারা বেশী করে যৌন-আকৃষ্ট হয়। কত সুন্দরী, ভালো পরিবারের মেয়ে সোমনাথকে বিয়ে করতে পারলে ধন্য হয়ে যাবে। অথচ সোমনাথের ঐ রকম নজর !

তখনও সোমনাথকে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেনি ইরা। ভেবেছিল, অন্য কোন সময় তাকে আকারে ইঙ্গিতে নিষেধ করে দেবে।

হেনাকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল ইরাদের বাড়ির চারতলার চিলেকোঠায়। কাল রাত বারোটার পর বাড়ির সবাই যখন আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে, তার কিছু পরে খুট্ করে একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিল ইরা। ইরার এমনিতে সহজে ঘুম আসে না। তার ঘুম খুব পাতলা। শব্দ শুনে সে নিঃশব্দে বাইরে এসে দেখে সোমনাথ সিঁড়িতে পা টিপে টিপে চারতলার ছাদের দিকে যাচ্ছে।

ব্যাপারটা বুঝতে কোন অসুবিধে হয়নি। ইরা অমনি বাইরের আলো জ্বেলে ডেকেছিল, সোমনাথ !

সোমনাথের মুখ চোখ ঠিক যেন তখন পাগলের মতন। ইরাকে যেন সে ভূত দেখল। তারপর দৌড়ে নেমে ঝড়ের বেগে নিজের ঘরে ঢুকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল।

আজ সকালে অবশ্য সোমনাথ ইরার কাছে ক্ষমা চেয়েছে, কিন্তু এরপর কি আর হেনাকে ও বাড়িতে রাখা যায়। হেনার কিছু দোষ নেই, তবুও।

ইরা প্রবলভাবে স্ত্রী-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। যে কোন নির্যাতিত রমণীর হয়ে সে সমাজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রস্তুত। সে বারবার বলতে লাগল, হেনার কোন দোষ নেই, দোষ সোমনাথের চরিত্রের বিশেষ একটি দিকের, ফ্রয়েড যা নির্দেশ করেছেন। কিন্তু হাজার হোক, সোমনাথ তার মামাতো ভাই, তাকে তো আর বাড়ি থেকে চলে যেতে বলা যায় না ? তাছাড়া আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ব্যাপারটা জানাজানি হলে কেলেংকারী হবে। সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়েই হেনাকে বাড়ি থেকে বিদায় করে দিতে হল।

ইরা প্রমিতাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল, যেন সে এ কথা আর কারুকে না বলে। এমন কি শৈবালকেও না। পুরুষমানুষদের বিশ্বাস নেই, তারা পেটে কথা চেপে রাখতে পারে না। শৈবাল যদি অন্যদের আবার বলে... ! সোমনাথের খুব শিগগিরই বিয়ে দিতে হবে, তাহলেই ঐ দোষ কেটে যাবে।

টেলিফোন সংলাপ শেষ হল ঠিক পঞ্চান্ন মিনিট পর। আরও পাঁচ মিনিট চললেও কোন ক্ষতি ছিল না।

হেনা আলু, বেগুন, ডিম সেদ্ধ সমেত ফ্যানা ভাত গরম করে টেবিলে দিয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে, তা এতক্ষণে জুড়িয়ে প্রায় বরফ।

প্রতিজ্ঞা রাখতে পারল না প্রমিতা। শয়ন কক্ষে শৈবালের জেরার চোটে ইরার

বাড়িতে হেনা বিষয়ক সব ঘটনা তাকে বলতেই হল। অবশ্য, সেও প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল। শৈবাল যেন কিছুতেই অন্য কারুকে না বলে।

প্রমিতার ভুরুতে সামান্য দুশ্চিন্তার রেখা দেখে শৈবাল তার স্ত্রীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় করে বলল, হে দেবী, ফ্রয়েড সাহেব যা-ই বলুন না কেন, দাসী, গোয়ালিনী, মেথরানী জাতীয় স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র লালসা নেই। তুমি যখন বাড়ি থাকবে না, কিংবা যখন বাপের বাড়ি যাবে, তখনও আমি হেনার প্রতি কু-দৃষ্টি দেবো না। আমি ট্যুরে গেলে তুমি যেমন অনন্তর সঙ্গে যে-রকম কিছু কর নি, সেই রকম আমিও হেনার সঙ্গে...। সুতরাং ওকে রেখে দাও, আর যেন লোক খুঁজতে না হয়।

প্রমিতা শৈবালের গালে এক আল্‌তো চাঁটি কষিয়ে বলল, এমন অসভ্যের মতন কথা বল। ঐ সোমনাথ ছেলেটি যেন কেমন কেমন, সব মেয়েদের দিকেই কি রকম যেন গিলে খাবার মতন করে তাকায়!

তোমার দিকেও সেরকমভাবে কখনো তাকিয়েছে নাকি?

হ্যাঁ।

তাহলে ফ্রয়েডের থিয়োরি ওর সম্পর্কে খাটল না। ছেলেটি দেখা যাচ্ছে পরিচ্ছন্ন, সুস্থ একটি কামুক। একটু বেশী বাড়াবাড়ি করে এই যা।

তুমি চুপ কর। আলো নেভাবে না? ঘুমে আমার চোখ টেনে আসছে একেবারে। সারাদিন যা টেনশান গেছে--

মাঝ রাত্রে আপনি ঘুম ভেঙে গেল শৈবালের। শরীরে কেমন যেন একটা অস্বস্তি, ছটফটানি। মনে হয় প্রত্যেকটি রন্ধ্রে ঝাঁ ঝাঁ করছে। চোখ দুটিতে জ্বালা জ্বালা ভাব।

নিজের কপালে হাত বুলিয়েই টের পেল তার বেশ জ্বর এসেছে! নাকের ডগায় একটা কি যেন! ফুস্কুড়ি না?

উঠে আলো জ্বেলে শৈবাল ড্রেসিং টেবলের আয়নার কাছে দাঁড়াল। শুধু নাকের ডগায় নয়, ডান ভুরুর ওপরেও আর একটা ফুস্কুড়ি উঠেছে। কোন সন্দেহ নেই। চিকেন পক্স তাকেও ছুঁয়েছে।

আলো নিভিয়ে বিছানায় ফিরে যেতে যেতে শৈবাল ভাবল, তার এই ব্যাপারটাই যদি আগের রাত্রে হত, তাহলে আজ সকালবেলা অনন্তকে অমনভাবে বিদায় করে দেবার দরকার হত না।

প্রমিতাকে ডাকল না শৈবাল। কিন্তু সারারাত তার আর ঘুম এলো না।

॥ আট ॥

পরদিন সকালবেলা হল রিন্টুর। বিকেলবেলা হিমাংশুবাবুর মেয়ের। এর পরের চারদিনের মধ্যেই এ বাড়ির সব ক'টা ফ্ল্যাটেই একজন দুজন করে চিকেন পক্সে শয্যাশায়ী। প্রথম প্রথম হিমাংশুবাবু খুব হম্বিতম্বি করে বলেছিলেন যে শৈবালদের ফ্ল্যাটের কাজের লোক অনন্তর জন্যই আজ গোটা বাড়িটার সব ক'টি পরিবারের এমন দুর্ভোগ। অনন্তকে সিঁড়ির নিচে শুইয়ে রাখার মতন এমন অন্যায় কাজও কেউ করে ?

কিন্তু একতলার ভাড়াটে শরবিন্দুবাবুর ভালো মানুষ স্ত্রী, এ বাড়ির সকলের সুধা বৌদি নিজে থেকেই স্বীকার করলেন যে তাঁর দেওর পাটনা থেকে এই অসুখ নিয়ে এসেছে অনন্তরও আগে। তাকে অতি যত্নে মশারির মধ্যে শুইয়ে রাখা হয়েছিল, সেই জন্য কেউ জানতে পারেনি। তা ছাড়া, পাড়ায় অনেক বাড়িতেই রয়েছে। গোটা কলকাতায় এ বছর চিকেন পক্সের এপিডেমিকের অবস্থা। সুতরাং বিশেষ কোন একজনকে দায়ী করার কোন মানে হয় না।

রিন্টু খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠলেও তারপর পড়ল বাবলি। শৈবাল ভুগল বেশ কিছু দিন। তার পরও শরীর দুর্বল। অফিস থেকে ছুটি নেবার ব্যাপারটা তার বাধ্য হয়েই হয়ে গেল, কিন্তু মোটেই উপভোগ করতে পারল না। জিভ বিস্বাদ। কোন কিছুই ভালো লাগে না। সিগারেট টানতে গেলে বমি এসে যায়। মাঝখান থেকে তার নেপাল ট্যুরটা ক্যানসেল্ হয়ে গেল।

প্রমিতারও হয়নি, হেনারও হয়নি। এই সময়টায় হেনা খাটল প্রাণ দিয়ে। প্রমিতাকে কিছু দেখতে হয়নি, হেনা একা হাতে সব করেছে। প্রমিতার বাপের বাড়ির লোকেরা পর্যন্ত হেনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

শৈবাল আর প্রমিতা মাঝে মাঝে আলোচনা করে যে এবার যদি অনন্ত ফিরে আসে, তাহলে কি হবে ? হেনাকে ছাড়াবার আর প্রশ্নই ওঠে না। অনন্তকেই বা কি বলা হবে ?

শৈবাল ভাবে, অনন্ত কি সত্যিই আর ফিরে আসবে ? অসুস্থ অবস্থায় তাকে এই বাড়ি থেকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছিল....এতদিনে তার সেরে যাবার কথা...। তারপরই সে প্রমিতার সঙ্গে অন্য বিষয়ে কথা বলে। কেন যেন, অনন্তর কথা মনে পড়লেই তার অস্বস্তি হয়।

প্রমিতা বলে, আমি ভাবছি আর কখনো ছেলে রাখব না। মেয়েই ভালো। শোবার ঝামেলা নেই। আমাদের ছোট ফ্ল্যাট!

হেনার শোওয়ার জায়গার সত্যিই ঝামেলা নেই। সে রিন্টু আর বাবলিদের ঘরের মেঝেতেই বিছানা পেতে শুয়ে থাকে। তাতে সুবিধে হয়েছে এই যে রিন্টু মাঝরাতে রোজ একবার করে বাথরুমে যায়। আগে সে মাকে ডাকত, কেননা বাথরুমের আলোর সুইচটাতে তার হাত যায় না। এখন সে হেনাকে ডেকে তোলে।

প্রমিতার মাঝে মাঝে কোমরে ব্যথা হয়। সব মেয়েরই যেমন হয়। এখন সেরকম ব্যথা উঠলে হেনা যত্ন করে প্রমিতার কোমর টিপে দেয়। অনন্তকে দিয়ে তো আর একাজ করানো যেত না!

শৈবাল তবু জিজ্ঞেস করে, কিন্তু অনন্ত এলে কি বলবে? তাকে তো ছাড়িয়ে দেওয়া হয়নি, আমি ছুটি নেবার কথা বলেছিলাম—

প্রমিতা বলে, অনন্ত এলে ওকে অন্য কারুর বাড়িতে দিয়ে দেব। ওর মতন কাজের ছেলেকে পেলে যে কেউ লুফে নেবে!

মাসখানেক পর সকলেই আবার সুস্থ স্বাভাবিক হল, শৈবাল অফিসে যেতে শুরু করল।

হেনা এখন সংসারের সব কাজ এমনই শিখে নিয়েছে যে প্রমিতা তার ওপর স্কুলফেরত ছেলেমেয়েদের খাবার খাওয়ানোর ভার দিয়ে সেই সময়টায় ফ্রেঞ্চ শিখতে যায়। এবং মাঝে মাঝেই বান্ধবীদের সঙ্গে মিটিং করে অবসর সময় কাটাবার জন্য সে বাচ্চাদের একটি স্কুল খোলার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় মেতে ওঠে। সেটা অবশ্য কোন দিনই কার্যে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

শৈবাল অফিসের বন্ধুদের পার্টি-টার্টিতে পরস্ত্রীদের সঙ্গে খানিকটা ফষ্টি-নষ্টি করে বটে কিন্তু বাড়িতে সে একেবারে গৃহী সন্ন্যাসী। হেনাকে সে নারী বলেই গণ্য করে না। হেনা ভিজে কাপড়েই থাকুক কিংবা তার বুক থেকে আঁচল খসে পড়ুক, সেদিকে শৈবাল একবারের বেশি দু'বার তাকায় না কখনো।

এ বাড়িতে নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া করে হেনার স্বাস্থ্যটি বেশ ভালো হয়েছে। গায়ের রং মাজা মাজা, মুখটা মন্দ নয়, হঠাৎ দেখলে ঝি বলে মনেই হয় না।

ইরা এবং অরুণ-মার্থা মাঝে মাঝেই আসে। প্রমিতার মুখে হেনার গুণপনার কথা শুনে প্রকাশ্যেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারা। দুটি সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা কারণে হেনাকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছিল তারা। তাদের দুটি পরিবারেই যথারীতি কাজের লোক নিয়ে দারুণ সমস্যা চলছে। ইরার বাড়ি অত্যন্ত আগোছালো। দামী দামী জিনিস এখানে

সেখানে পড়ে থাকে, তার বাড়িতে এক একজন কাজের লোক বা কাজের মেয়ে আসে, দু-তিনদিন পরই তারা কিছু না কিছু চুরি করে পালায়। ইরার মামাতো ভাইয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। বিয়ের পরই সস্ত্রীক সোমনাথ লণ্ডনে যাবে। তার ঝি-আসক্তির কথা জানাজানি হয়নি। বোধ হয় এতদিনে সে নিজেও ভুলে গেছে সে কথা।

মার্থা আগের মতনই নাকি সুরে অভিযোগ জানায়। তার বাড়িতে কারুকে বা ছাড়িয়ে দিতে হয় ঝাল রান্নার জন্য, কেউ বা গরুর মাংস দেখে ঘেন্নায় নিজে থেকেই পালায়। যত বলি জাল ডেবে না, লোংকা একডম ডেবে না, টবু থিক ডেবে! বেংগালিরা কি লোংকা চারা কোন কিসু রাঁডটে জানে না?

অরুণ অবশ্য একটু ঝাল রান্নাই ভালোবাসে। মেম বউয়ের পাল্লায় পড়ে আ-ঝালি, সেদ্ধ সেদ্ধ খাবার খেতে সে বাধ্য হয় বটে, কিন্তু অন্য কোন বাড়িতে খেতে গেলেই সে কাঁচা লঙ্কা চেয়ে নেয়।

ইদানীং মার্থার আবার কাজের লোকের দারুণ সংকট চলছে। এক সপ্তাহ ধরে তাদের কেউ নেই। তাই সে ঘন ঘন আসছে প্রমিতার কাছে। তবে প্রমিতার এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জটাও এখন বেশ দুর্বল হয়ে গেছে। ঝি-চাকর আর পাওয়াই যায় না। অথচ সারা দেশে নাকি এখনো খেতে পায় না বহু লোক।

দু'মাস কেটে গেছে। অনন্ত ফিরে আসেনি। অর্থাৎ সে আর আসবে না। সে কি অভিমান করে এলো না? নাকি দেশেই থেকে গেল?

এ বাড়িতে কেউ আর অনন্তর নাম উচ্চারণ করে না। রিন্টুও এর মধ্যে ভুলে গেছে। অনন্তর একজোড়া চটি পড়ে ছিল পিছনের বারান্দায়, প্রমিতা একদিন জমাদারকে ডেকে সে চটি জোড়া ফেলে দিতে বলল।

শৈবালের একটা কাজ বেড়েছে আজকাল। বাজার করতে হয়।

হেনাকে দিয়ে আর সব কিছুই হয়, কিন্তু বাজার করাটা সুবিধের হয় না। অনন্ত চমৎকার গুছিয়ে বাজার করত। দু-চার পয়সা সে চুরি করত কি না কে জানে। কিন্তু প্রমিতা খবরের কাগজের বাজার দর পড়ে দেখত, অনন্তও ঠিক একই দাম বলে সব জিনিসের।

আর হেনা গ্রামের মেয়ে হলেও মাছ চেনে না একেবারেই। বেশী পয়সা দিলেও সে যা-তা মাছ নিয়ে আসে।

শৈবাল বাজার করা একদম পছন্দ করে না। শৈবালের ধারণা, সে অফিসে প্রচুর পরিশ্রম করে টাকা পয়সা রোজগার করে আনে বলে, বাড়িতে যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ তার আলস্য-বিলাসিতা করার অধিকার আছে। কিন্তু রোজ রোজ আর

কাঁহাতক পচা মাছ কিংবা তেলাপিয়া কিংবা কাঁটা ভরা বাটা মাছ খাওয়া যায় ? বাধ্য হয়েই হিমাংশুবাবুর মতন ভোরে উঠেই চা খাবার আগে বাজার যেতে হয় তাকে। অবশ্য সে পাজামার উপর পাঞ্জাবি পরে। এবং বাজারে হিমাংশুবাবুকে দেখলে সে দূর থেকে এড়িয়ে যায়।

দাদাবাবু।

বাজার থেকে ফেরার পথে একদিন শৈবাল যেন সকালবেলাতেই ভূত দেখল।

তার সামনে দাঁড়িয়ে অনন্ত। তারও হাতে ভর্তি বাজারের থলে।

সত্যি সত্যি ভয়েই কেঁপে উঠেছিল শৈবাল। অনন্ত যদি এখন তাকে একটা গালাগালি দেয় কিংবা মারার চেষ্টা করে ! সে কি করবে ?

অনন্ত ঢিপ করে শৈবালের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে অত্যন্ত লাজুক বিনীত গলায় বলল, ভালো আছেন দাদাবাবু ?

শৈবালের গলা শুকিয়ে গেছে। তারই তো অনন্তকে জিজ্ঞেস করার কথা যে সে ভালো আছে কি না ! শৈবাল কিছু বলতে পারল না। একটা অপরাধবোধ যেন তার গলা টিপে ধরেছে।

রিন্টু, বাবলি, বৌদি, সব ভালো আছেন তো ?

এবার শৈবাল কোন ক্রমে বলল, হ্যাঁ। তুই কেমন আছিস ?

ঠিক ডান পাশের বাড়িটার দিকে হাত দেখিয়ে অনন্ত বলল, আমি এখন এই বাড়িতে কাজ করি।

শৈবালের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ কিংবা আক্রোশ দেখাবার বদলে অনন্ত মুখে এমন একটা হাসি ফুটিয়ে তুলল, যেন সে-ই অপরাধী।

তারপর যেন কৈফিয়ৎ দেবার সুরেই সে বলল, আমি তখন দেশে যাইনি। বালিগঞ্জ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে শুয়ে ছিলাম। এ বাড়ির ডাক্তারবাবু বাড়িতে নিয়ে এলেন।

শৈবাল একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। দেশে সত্যিকারের দয়ালু, মানবহিতৈষী লোক আছে তাহলে। রেল স্টেশন থেকে এক বসন্তের রুগীকে বাড়িতে এনে চিকিৎসা করেছেন।

পরমুহূর্তেই সে ভাবল, কিংবা এমনও হতে পারে, ঐ ডাক্তারটিরও বাড়িতে কোন কাজের লোকের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একটা মোটামুটি ভদ্র চেহারার ছোকরাকে দেখতে পেয়ে নিয়ে এসেছে। ডাক্তার মানুষ, ভালো করেই জানে যে চিকেন পক্স এমন কিছু ভয়ের অসুখ নয়।

অনন্ত আবার বলল, আমি এখন এই ডাক্তারবাবুর চেম্বারের কাজ করি।

শৈবাল চোখ তুলে ডাক্তারটির সাইন বোর্ড দেখল। অনন্তর পদোন্নতি হয়েছে তাহলে। সে আর চাকর নয়। ডাক্তারের অ্যাসিস্ট্যান্ট। রুগীদের স্লিপ নিয়ে ডাক্তারের টেবিলে দিয়ে আসে। ডাক্তারবাবু আসবার আগে চেম্বারটা পরিষ্কার করে রাখে। অনন্ত লেখাপড়াও জানে কিছুটা।

একবার আসিস আমাদের বাড়িতে, এ কথা বলতে গিয়েও বলল না শৈবাল। যেন তার অধিকার নেই এ কথা বলার।

সামান্য কিছু বিড়বিড় করে সে অনন্তর কাছ থেকে বিদায় নিল।

বাড়ি ফিরে সে খুবই নাটকীয় উত্তেজনার সঙ্গে খবরটা জানাল প্রমিতাকে।

প্রমিতার মধ্যে বিশেষ কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। তার নিজের এখন ভালো কাজের লোক আছে, পুরোনো লোকেরা কে কোথায় কাজ করে তা নিয়ে তার কোন আগ্রহ নেই।

ছেলেমেয়েরাও একবারও বললো না, অনন্তকে ফিরিয়ে আনবার কথা। অথচ ওদের সঙ্গে খুবই ভাব ছিল অনন্তর।

তারপর থেকে প্রায়ই অনন্তর সঙ্গে দেখা হয় শৈবালের। সে যখন বাজারে যায়, তখনও ঐ ডাক্তারের চেম্বার খোলার সময় হয় না। অনন্ত সেই সময়টা চেম্বারের দরজা খুলে ঝাড়-পোঁছ করে। শৈবালের সঙ্গে চোখাচোখি হলে শ্রদ্ধা ও নমস্কারের ভঙ্গিতে হাসে অনন্ত। একদিন শৈবালের বাজারের থলি থেকে একটা জ্যান্ত কৈ মাছ লাফিয়ে পড়ে গিয়েছিল রাস্তায়, অনন্তই ছুটে এসে তুলে দিয়েছিল মাছটা। শৈবাল জ্যান্ত কৈ মাছ ধরতে ভয় পায়। দেখা যাচ্ছে, অনন্ত এখনো পুরোনো মনিবকে খাতির করে।

সুখের নিয়মই এই যে তা মাঝে মাঝেই চঞ্চল হয়ে পড়ে।

শৈবালের সুখের সংসারেও ফাটল দেখা দিল আবার। চার পাঁচ মাস কাটতে না কাটতেই প্রমিতার কাছ থেকে আবার হেনা সম্পর্কে অভিযোগ শুনতে হল শৈবালকে।

একদিন প্রমিতা বলল, যা-ই বল, গ্রাম থেকে ভালো মানুষটি সেজে এলেও এখানকার ঝানু ঝি-চাকরদের সঙ্গে মিশে দু'দিনেই ওরা সেয়ানা হয়ে ওঠে।

শৈবাল বলল, ঝি-চাকর বলছ যে? তুমিই না বলেছিলে—

এখানে তো আর কেউ শুনছে না।

কী করেছে ও? কাজ তো ভালোই করে।

তা করে। কিন্তু একটাই ওর প্রধান দোষ, একবার বাইরে গেলে কিছুতেই আর ফিরতে চায় না। কোথায় থাকে কে জানে? আজকাল সকালে চা দিতে কত দেরি করে, দেখেছ? ভোরে দুধ আনতে গিয়ে ফেরে দেড় ঘন্টা বাদে। বলে কিনা, মস্ত বড় লাইন। এতদিন লাইন ছিল না, আমার আগের লোকেরা সবাই আধ ঘন্টার মধ্যে ফিরে আসত, আর এখনই হঠাৎ লাইন বড় হয়ে গেল? শুনলে বিশ্বাস করা যায়?

শৈবাল বলল, হুঁ!

কাল ওকে এক প্যাকেট মাখন কিনতে পাঠালাম, ফিরল ঠিক দু'ঘন্টা পরে। আমি তো চিন্তায় মরি! গাড়ি চাপা পড়ল না কী হল! আমাদের রাস্তাটা যা খারাপ। ও মা, সে সব কিছুই হয়নি, হেলতে দুলতে ফিরল।

কেন দেরি হল জিজ্ঞেস করলে না?

বলল, মাখন পায়নি!

মাখন পায়নি তো এত দেরি?

সেই কথাই তো বলছি! ওকে যত জিজ্ঞেস করি কোন উত্তর দেয় না। আজকাল কেমন যেন উদাস ভাব। কথা বললে মন দিয়ে শোনে না।

হুঁঃ!

আমার কী মনে হয়, জানো? ও কোন আজেবাজে লোকের সঙ্গে মিশছে। চেহারাখানা তো খোলতাই হয়েছে বেশ! আজেবাজে গুণ্ডা বদমাশরা ওর দিকে নজর দেবেই। আর ও মেয়েটাও তো বোকা।

হুঁঃ!

হুঁ হুঁ করছ কী? আমার তো একটা কথা ভেবে ভয়ই ধরে গেছে। এই ধর, গত রোববার আমরা চন্দননগর গেলাম, সারাদিন কেউ বাড়িতে ছিলাম না, ওর ওপর সব কিছুর ভার দিয়ে গেছি, ও যদি সে রকম কোন আজেবাজে লোককে আমাদের ফ্ল্যাটে ঢোকায়...একটি বিশ্রী কেলেঙ্কারিতে পড়তে হবে না?

তা করবে না, মেয়েটা এমনিতে ভালো।

ভালো হলেই বা, বোকা যে। তা ছাড়া এই বয়সে—

একটা কথা বলব?

কী?

শৈবাল ভালো করে সিগারেটে টান দিয়ে প্রমিতার চোখে চোখ রেখে বলল, হেনার একটা বিয়ে দিয়ে দাও।

বিয়ে ?

হ্যাঁ। এই বয়েসেই গ্রামের মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়। শুধু গ্রামের মেয়ে কেন, ওর তো একুশ-বাইশ বছর বয়েস...ঝি-চাকরের কাজ করলেও ওদের তো একটা শরীরের ক্ষুধা আছে। যৌবনে কুক্কুরী ধন্যা। ওর যৌবন এসেছে, ও-ও তো কোন পুরুষমানুষকে চাইবেই। আর কোন পুরুষমানুষ যদি ওকে চায়, তাহলে ওই বা আকৃষ্ট হবে না কেন ? সেই জন্যই বলছি, ওর একটা সুস্থ সামাজিক জীবনের জন্য একটা বিয়ে দেওয়া দরকার।

ওর বিয়ে আমরা দেব কী করে ? ওর বাবা এসে কী বলবে না বলবে।

ও তো গ্রামে নিজের বাবার কাছে ফিরতে চায় না শুনেছি।

আর একটা কথা, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, ও নিজেই একদিন বলেছিল যে খুব কম বয়সে ওর বাবা জোর করে একজন বুড়োর সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছিল। ওদের সমাজে বিয়েতে মেয়ের বাবা টাকা পায়। ওর সেই বর অবশ্য বিয়ের তিন চার মাস বাদেই মারা গেছে। ও আসলে বিধবা।

বিদ্যাসাগরমশাই বিধবা বিবাহ আইন পাশ করে গেছেন বহু দিন আগে।

প্রমিতা এবার রাগত সুরে বলল, বেশ তো, তুমি ওর বিয়ের ব্যবস্থা কর। তোমার যদি অত গরজ থাকে !

শৈবাল চুপ।

প্রমিতা আবার বলল, ওর বিয়ে হলে ও আর আমাদের বাড়িতে কাজ করবে ?

অনেক বিবাহিত মেয়েও তো কাজ করে দেখেছি।

সে শুধু ঠিকের কাজ। তারা বাড়িতে থাকে না। যাদের বর নেয় না কিংবা অন্য রকম গোলমাল আছে তারাই শুধু বাড়িতে থেকে কাজ করে।

শুধু আমাদের এখানে কাজ করবে বলেই ঐ মেয়েটি সারা জীবন বিয়ে করতে পারবে না ?

বেশ তো, টাকা পয়সা যোগাড় করে তুমি যদি ওর বিয়ে দিতে পারো—

শৈবাল আবার চুপ।

ঝি চাকরের কাজ যারা করে তাদেরও দেহের ক্ষুধা আছে, তাদের একটা সুস্থ সামাজিক জীবন দিতে গেলে ঠিক সময়ে বিয়ে হওয়া উচিত, এটা শৈবাল বিশ্বাস করে। কিন্তু সে নিজে উদ্যোগী হয়ে যোগাড়যন্ত্র করে এই হেনার মতন কোন মেয়ের বিয়ে দেবে, এ শৈবালের পক্ষে সম্ভব নয়। তার সময় কোথায় ? অফিসের কাজ আছে না ? যে সব অফিস ভালো মাইনে দেয়, তারা নাকে দড়ি দিয়ে কাজ করিয়ে

নেয়। ম্যানেজিং ডাইরেক্টার বোম্বে ট্যুর থেকে ফিরলে তাঁকে রিসিভ করার জন্য রোববার সকালেও শৈবালকে ছুটতে হয় এয়ারপোর্টে।

এর দু'দিন পরে প্রমিতা আবার রাত্তিরবেলা চোখ বড় বড় করে শৈবালকে বলল, আজ কী হয়েছে জানো ?

শার্ট, প্যান্ট, জাঙ্গিয়া ছেড়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়েও শৈবাল ওয়ার্ডরোবে পাজামা খুঁজে পেল না। সে ঠিক সেই অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে ক্লান্ত গলায় বলল, আগে তোমার কথাটা বলে নাও, তারপর পাজামাটা খুঁজে দিও।

শৈবাল যে জায়গাটা খুঁজেছিল, ওয়ার্ডরোবের ঠিক সেই জায়গাটাতেই হাত দিয়ে ম্যাজিকের মতন একটা পাজামা বার করে আনল প্রমিতা। সেটা শৈবালের শরীরের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে সে বলল, রিন্টু-বাবলিকে হেনার কাছে রেখে আমি ফ্রেঞ্চ ক্লাসে গিয়েছিলাম। এসে দেখলাম হেনা নেই। কিছু বলে যায়নি ওদের। কোন রকমে খাবারটা দিয়ে চলে গেছে। ফিরল আমি ফেরারও এক ঘন্টা পরে। জিজ্ঞেস করতে কিছু উত্তর দিল না। এমন আস্পর্ধা হয়েছে !

শৈবাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল এবার এ বাড়ি থেকে হেনার পাট উঠল। দু-চারদিনের মধ্যেই প্রমিতা ওকে তাড়াবে।

তাড়াতে হল না, তার পর দিনই হেনা উধাও হয়ে গেল। সন্ধ্যেবেলা কী একটা ছুতো করে সে বেরিয়েছিল, রাত্রে আর ফিরলেই না ! রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত তার জন্য অপেক্ষা করে বসে ছিল শৈবাল আর প্রমিতা। পরের দিনও তার পাত্তা নেই।

সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল প্রমিতা, কিছু চুরি গেছে কিনা। প্রথমেই মনে হয়, এটা নেই, ওটা নেই, সেই ঝুমকো দুল জোড়া ? মেয়ের জন্য শখ করে কেনা রুপোর নাকছাবি ? কালো রঙের পেটিকোটটা ? এই উপলক্ষে অনেক হারানো জিনিস খুঁজে পাওয়া গেল এখান সেখান থেকে। বাসপনত্রও গুনে মিলিয়ে দেখল। এমন কি, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, কিছুই খোয়া যায়নি। হেনা নিজেই শুধু অদৃশ্য হয়ে গেছে। এমন কি তার গামছা, ব্লাউজ, একখানা ছেঁড়া শাড়িও পড়ে আছে।

দু' দিন পরেও হেনা না ফেরায় শৈবাল বলল, যতদূর মনে হচ্ছে, মেয়েটা ইচ্ছে করে চলে যায়নি, তাহলে নিজের জিনিসপত্র অন্তত নিয়ে যেত।

প্রমিতা বলল, তাই তো মনে হচ্ছে।

এ পাড়ার মধ্যে অ্যাকসিডেন্ট হলেও ঠিক খবরটা কানে আসত। সে তো বেশী দূরের রাস্তাঘাট চেনেও না।

কে জানে এতদিনে চিনে গিয়েছিল কি না।

কোন গুণ্ডা-ফুণ্ডার পাল্লায় পড়ল না তো? স্বাস্থ্য ভালো, শুনেছি অনেকে মেয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে। পুলিশে একটা খবর দেওয়া উচিত।

পুলিশে?

প্রমিতা বলল, তুমি একবার থানায় যাও, একটা ডায়েরি অন্তত করে রাখা দরকার। ধর যদি, কথার কথা বলছি, খুন-টুন হয়। কোথাও ডেড বডি পাওয়া যায়, তখন—মানে—আমাদের বাড়ি থেকেই তো গেছে। আমাদের ওপর কোনো রকম দোষ পড়বে না তো?

শৈবালেরও মনে হল, প্রমিতার কথায় যুক্তি আছে। এসব ক্ষেত্রে থানায় একটা ডায়েরি করাই নাগরিক কর্তব্য।

কিন্তু থানা পর্যন্ত সশরীরে যেতে তার আর ইচ্ছে করল না। যে কোনো কারণেই হোক পুলিশ-ফুলিশের সংসর্গ তার পছন্দ হয় না। ছাত্র বয়সে কলেজ স্কোয়ারে মিছিল করতে গিয়ে একবার পুলিশের হাতে মার খেয়েছিল, সেই স্মৃতি এখনো মনে জেগে আছে। সে টেলিফোনে কাজ সারতে চাইল।

থানার ও সি শৈবালের কথায় কোনো গুরুত্বই দিলেন না। কিছু যখন চুরি করে পালায়নি, তখন আর শৈবালের অত মাথাব্যথা কী আছে? কেউ যদি ইচ্ছে করে কাজ ছেড়ে চলে যায়, তবে তাকে আটকাবার কোনো এখতিয়ার পুলিশের নেই? ঝি মানে তো আর ক্রীতদাসী নয়, কী বলুন? আপনারা শিক্ষিত লোক...। যুবতী ঝি প্রসঙ্গে দারোগাবাবু শৈবালকে একটি অশ্লীল রসিকতা শুনিয়ে দিলেন পর্যন্ত!

অতএব শৈবালের দায়িত্ব শেষ। তবু আরও দু'তিন দিন উদ্বিগ্নভাবে প্রতীক্ষা করা হচ্ছে হেনার জন্য। কিন্তু সে সত্যিই এলো না।

সুখ ও দুঃখ চক্রবৎ জায়গা পরিবর্তন করে। শৈবালের সংসারে এখন দুঃখের রাজত্ব। আবার ওদের লোক খোঁজাখুঁজি, আবার প্রমিতার মুখভার। আবার চীনে দোকানে রাত্রে যাওয়া।

এখন প্রমিতা পদে পদে খুঁত ধরে শৈবালের। সে কেন অফিস থেকে দেরি করে ফেরে? সে কেন ছেলে-মেয়ের পড়াশুনোর দিকে একটু মন দেয় না? খাটতে খাটতে যে প্রমিতার শরীর একেবারে কালি হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে কি শৈবাল একটুও নজর দেয়?

বাড়ি ফেরার পর শৈবাল সর্বক্ষণ তটস্থ থাকে।

প্রমিতা পাগলের মত কাজের লোক খুঁজছে। টেলিফোনে, লোকের বাড়ি গিয়ে

গিয়ে কাকুতি মিনতি। একজনকে কোনক্রমে পাওয়া গেল। সে থুত্থুরে বুড়ি। প্রথম দিনই মাছের ঝোলে পাওয়া গেল লম্বা পাকা চুল। সে বুড়ি আবার রান্নাঘরের মধ্যেই পিচপিচ করে থুতু ফেলে। পরের দিনই বিদায় করা হল।

প্রমিতা বলল, সে আর মেয়ে রাখবে না, ঢের শিক্ষা হয়েছে। এবার সে ছেলে রাখবে, ওদের দায়িত্বজ্ঞান থাকে।

সামনের বাড়ির দারোয়ানের একজন লোক ছিল। সে হিন্দুস্থানী, কিন্তু নাকি ভালো রান্না করে। রীতিমতন লম্বা চওড়া, ষণ্ডামার্কা জোয়ান। তাকে দেখেই ভয় হয়। প্রমিতা দুপুরে একা থাকে, এমন লোককে বাড়ির কাজে রাখা যায় না। শৈবাল এক কথায় খারিজ করে দিল তাকে। তা ছাড়া এত বড় একজন পালোয়ান টাইপের লোক দিয়ে রান্নার কাজ করানো মানে দেশের শ্রমশক্তির অপচয়!

গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মতন দু'সপ্তাহ ধরে রান্নার গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না। কেরোসিন উধাও। এই সব জিনিস ব্ল্যাক মার্কেটে কী ভাবে যোগাড় করা যায়, তা অনন্ত জানতো। শৈবাল কিছুই সন্ধান জানে না। অন্দর মহলে এখন রীতিমতো বিপর্যয়। প্রমিতা প্রায়ই বলে, এখন আমি কী করবো, কী করে সংসার চালাবো, তুমি বলে দাও! শৈবাল নিরুত্তর।

শৈবাল একবার ভেবেছিল, অনন্তকেই আবার এ বাড়িতে কাজ করার প্রস্তাব দেবে কিনা। কিন্তু অনন্ত এখন ডাক্তারের চেম্বারের অ্যাসিস্ট্যান্ট, নিশ্চয়ই তার মাইনে অনেক বেশী। ও রকম কাজ ছেড়ে সে আবার রান্নার কাজ করতে আসবেই বা কেন?

তা ছাড়া শৈবাল কোন মুখেই বা অনন্তকে এই প্রস্তাব দেবে। অনন্ত যদি জিজ্ঞেস করে আমার যদি পক্স কিংবা ইনফ্লুয়েঞ্জা হয় আবার, আপনারা আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবেন তো? ডাক্তারখানায় কাজ করে অনন্ত নিশ্চয়ই এই সব ব্যাপার শিখে গেছে এতদিনে। লেগে থাকলে সে একদিন কম্পাউণ্ডারও হতে পারবে। সে কেন আর রান্নার কাজ করবে।

অনন্তর সঙ্গে দেখা হলেই শৈবাল লজ্জা পায়। মনের একটা গ্লানির ভাব ঠিক অম্বলের জ্বালার মতন ধাক্কা মারে। কাজটা মোটেই উচিত হয়নি। তখন প্রমিতার কথায় সায় না দিয়ে যদি অনন্তকে আরও দু'এক দিন রেখে দেওয়া যেত...।

ঝি-চাকরদের একটা নিজস্ব বেতার কেন্দ্র আছে। তার মাধ্যমে তারা নিজেদের খবর পরস্পরের মধ্যে চালাচালি করে। এ বাড়ির অন্য ফ্ল্যাটের ঝি-চাকরদের থেকে মাঝে মাঝে হেনা সম্পর্কে টুকরো-টাকরা খবর শোনা যেতে লাগল।

কে নাকি তাকে দেখেছে পঞ্চাননতলার কাছে একদিন দাঁড়িয়ে থাকতে। এরই মধ্যে সে খুব রোগা হয়ে গেছে।

আবার অন্যজনের খবর সম্পূর্ণ উল্টো। এক পাঞ্জাবী ড্রাইভার নাকি তাকে লোভ দেখিয়ে একেবারে পাঞ্জাব নিয়ে চলে গেছে। একজন তাকে নাকি দেখেছে লাল শাড়ি পরে ট্যাক্সিতে এক পাঞ্জাবী ড্রাইভারের পাশে বসে থাকতে।

অন্য একটি কাহিনী আরও চিত্তাকর্ষক। এ পাড়ারই একজন লোকের সঙ্গে হেনার আশনাই ছিল খুব। প্রায়ই তারা দেখা করত। একদিন নাকি এক বাড়ির ছাদে তাদের খুব রসালো মুখোরচক অবস্থায় দেখা গেছিল। বাড়ির মালিক তাদের দেখতে পেয়ে জোর করে ঘাড় ধরে কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে সিঁদুর পরিয়ে বিয়ে দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন।

শেষ কাহিনীটিরও সত্যতা প্রমাণ করার কোন উপায় নেই। কোন্ বাড়ি, কোন্ লোক, বা বিয়ের পর তারা কোথায় গেল তাও বলতে পারে না। এ রকম ভাবে বিয়ে হলে হেনার পক্ষে তো খুব স্বাভাবিক ছিল প্রমিতা আর শৈবালকে এসে প্রণাম করে যাওয়া। বিয়ে করলেই তো সব দোষ কেটে যায়।

সত্যি সত্যি কারুকে বিয়ে করে, কাছাকাছি কোন বস্তিতে ঘর ভাড়া নিয়ে হেনা যদি এ বাড়িতে দু'বেলা রান্নার কাজও করে দিয়ে যেত, তা হলেই সুষ্ঠু হতো সব ব্যাপারটা।

হেনার অন্তর্ধান কাহিনী রহস্যময় হয়েই রইল।

প্রমিতার রান্না ঘরে মাঝে মাঝে দু'একজন অপছন্দের কাজের লোক কিংবা কাজের মেয়ে আসে, আবার তারা অবিলম্বে ছাঁটাই হয়ে যায়। অর্থাৎ অশান্তি চলতেই থাকলো।

ইরার বাড়িতে নাকি এখন দু'জন খুব বিশ্বাসী কাজের লোক পাওয়া গেছে। ইরা-কে এখন ঈর্ষা করে প্রমিতা।

একদিন বাজারে যাবার পথে শৈবাল থমকে দাঁড়াল। যে ডাক্তারের চেম্বারে অনন্ত কাজ করত, সেখানে অন্য একজন লোক ঝাড়পোঁছ করছে। শৈবালের খটকা লাগল। অনন্ত গেল কোথায় ?

সে এগিয়ে গিয়ে নতুন লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, এখানে অনন্ত নামে একজন কাজ করত না ?

লোকটি গম্ভীরভাবে বলল, হ্যাঁ।

সে আছে ?

না।

সে কি ছুটিতে গেছে ?

না, ডাক্তারবাবু তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন।

এ লোকটি বেশ গম্ভীর, বেশী কথা পছন্দ করে না। সে আবার নিজের কাজে মন দিয়েছে। শৈবাল আবার জিজ্ঞেস করল, ভাই, তুমি জানো, ডাক্তারবাবু কেন তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন ?

লোকটি প্রায় খেঁকিয়ে উত্তর দিল, আমি তা কী জানি ! ডাক্তারবাবুকেই জিজ্ঞেস করবেন।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে শৈবালের মনে হল, এমনও তো হতে পারে, অনন্তর সঙ্গেই হেনার প্রেম হয়েছিল। হেনা চিনত অনন্তকে। সেই যে একদিন অসুস্থ অবস্থায় অনন্ত জল চেয়েছিল, হেনা জল দিয়েছিল তাকে। এখান থেকে শৈবালদের বাড়ি বেশী দূরে নয়। অনন্তর সঙ্গে হেনার নিয়মিত দেখা হওয়া খুবই সম্ভব। ডাক্তারবাবু যখন চেম্বারে থাকেন না, তখন ওরা দুজনে অনায়াসে ঘনিষ্ঠ হতে পারত। একদিন ধরা পড়ে যায়। তারপর ডাক্তারবাবু একদিন ওদের দুজনকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। অনন্ত স্ত্রীকে নিয়ে ফিরে গেছে নিজের গ্রামে। ওরা এখন স্বাধীন।

কিন্তু কাহিনীর পরিসমাপ্তি যাতে মধুর হয়, জীবনে সব সময় তা ঘটে না। সরলরেখাগুলোকে ভেঙে দিতেই যেন মানুষের গড়া সমাজ বেশী ভালোবাসে। যা সকলের মনোমত হতে পারত, কেউ তা তছনছ করে দেয়।

অনন্ত আর হেনার বিয়ে হলে, তারা কারুকে কিছু না বলে পালাবে কেন ? বিয়ের পরও তো অনন্ত চাকরি করতে পারত ডাক্তারখানায়, হেনা থাকতে পারত শৈবালদের বাড়িতে। কিংবা বৈধ স্বামী স্ত্রী হিসাবে যদি তারা চলে যেতে চাইত কোথাও, তাহলে ওরা তো দুজনে একসঙ্গে এসে শৈবাল প্রমিতার আশীর্বাদ নিতে পারত। প্রমিতা নিশ্চয়ই একটা নতুন শাড়ি কিনে দিত হেনাকে। এতদিন চাকরি করেও কি প্রমিতার মনটা বোঝেনি হেনা ! প্রমিতা সব সময় কাজের লোকদের সমান মাছের টুকরো দেয় ! রাস্তায় দেখা হলে অনন্ত সেদিনও খাতির করেছে শৈবালকে, সেও কি জানে না, তার বাবু লোক খারাপ নন।

বিয়ে করে বৌ নিয়ে গিয়ে দেশের বাড়িতে যদি খাওয়া পরার মতন অবস্থা থাকতই, তাহলে অনন্ত এতকাল চাকর-রাঁধুনির কাজ করল কেন ? রিন্টু-বাবলির সঙ্গেও ওরা দেখা করে গেল না একবার ? এতদিন কাজ করলেও একটুও মায়া পড়ে না ?

হয়তো ডাক্তারখানায় কাজ করতে করতে চুরি করা শিখেছিল অনন্ত। ওষুধ-

পত্র সরাত। পেসেন্টদের কাছ থেকে আলাদা টাকা নিত। ধরা পড়ে গেছে ডাক্তারবাবুর কাছে। নইলে, যে ডাক্তার একজন পক্সের রুগীকে রেলের প্ল্যাটফর্ম থেকে তুলে এনেছিলেন, তাকে তিনি এক কথায় ছাড়িয়ে দেবেন কেন?

এখান থেকে বিতাড়িত হয়ে অনন্ত হয়তো আবার অন্য পাড়ায় চাকরির সন্ধানে গেছে। হেনার সঙ্গে তার বোধহয় আর কখনো দেখাই হয়নি। ভদ্দরলোকেরা যেমন কথায় কথায় প্রেমে পড়ে, ওদের মধ্যে কি সে রকম প্রেম চালু আছে? বেঁচে থাকার তাগিদটাই ওদের জীবনে প্রধান নয়?

কিংবা স্বাস্থ্যবতী অথচ বোকা মেয়ে হেনা হয়তো পড়েছে লম্পট গুন্ডাদের পাল্লায়। তারা ওর যৌবন লুটে পুটে নিয়ে ছিবড়ে করে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তখনও যদি ছিটোফোঁটা যৌবন অবশিষ্ট থাকে, তাহলে হেনা নাম লেখাবে কালীঘাট কিংবা সোনাগাছির বেশ্যাপল্লীতে। আর যদি চেহারাটা একেবারে ভাঙাচোরা হয়ে যায়, তাহলে পাঁচ বাড়িতে ঠিকে ঝির কাজ নিয়ে পেট চালাবে।

ডাক্তারের চেম্বারের সামনে দাঁড়িয়ে শৈবাল এই সব সাত পাঁচ ভাবে। হেনা কিংবা অনন্ত চলে যাবার ফলে তার বাড়িতে খুবই গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছে বটে, কিন্তু ওরা দু'জনে যদি জীবনে সুখী হয়...।

ডাক্তারবাবুটির কাছে জিজ্ঞেস করলে তিনি হয়তো অনন্তকে চাকরি থেকে তাড়াবার আসল কারণটি বলে দিতে পারেন, কিন্তু শৈবাল জিজ্ঞেস করতে চায় না। যদি ব্যাপারটি সত্যিই এ রকম নিষ্ঠুর হয়। নিষ্ঠুর ঘটনার মুখোমুখি হতে চায় না শৈবাল।

তার বদলে মাঝে মাঝে সে একটি দৃশ্য কল্পনা করে। হেনাকে বিয়ে করে অনন্ত ফিরে গেছে সুন্দরবনে তার নিজের বাড়িতে। মাতলা নদীর ধারে ছবির মতন ছোট্ট একটি মাটির বাড়ি। সামনের খানিকটা জমিতে বেগুন আর লঙ্কাগাছ। রান্নাঘরের দু'পাশে একটি গোয়াল ঘর আর একটি ধানের গোলা। কিছু দূরের মাঠে হাল-বলদ আর লাঙল নিয়ে অনন্ত চাষ করছে নিজের জমিতে। আকাশ-ছাওয়া বৃষ্টি ভরা কালো মেঘ। বাড়ির সামনের জায়গাটায় শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়ে স্বাস্থ্যবতী হেনা জল দিচ্ছে বেগুন গাছগুলোর গোড়ায়। সে গুনগুন করে গাইছে একটা পল্লীগীতি। একটা এক বছরের শিশু ধুলোবালি মেখে খেলছে মাটিতে আর খলখল করে হাসছে। হেনা মাঝে মাঝে গান থামিয়ে ছেলের দিকে তার ঘামে ভেজা মুখটি ফিরিয়ে বলছে, দাঁড়া তো রে দুষ্টু, দেখাচ্ছি তোকে—

এই মনোরম দৃশ্যটি কল্পনা করে আদর্শবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক শৈবাল ভারী তৃপ্তি পায়।

